৭.১৭ রক্তপায়ী বাদুড় ও দস্যু বনহুর – Bangla Library

৭.১৭ রক্তপায়ী বাদুড় ও দস্যু বনহুর – Bangla Library

রক্তপায়ী বাদুড় ও দস্যু বনহুর–১১৭

কি হয়েছে তোমার? অমন উদভ্রান্তের মত পায়চারী করছো কেন? ঘুমাবেনা? কথাগুলো বললেন মিসেস হুদা।

এত রাতে স্বামীকে বাসায় ফিরে আসতে দেখে তিনি মোটেই অবাক হয়নি, কারণ মিঃ হুদা প্রায়ই এমনি রাত করেই ফেরেন। আজ বাসায় ফিরে তিনি যেন অস্থির বোধ করছেন। কেন তিনি এমনভাবে ক্ষিপ্তের মত পায়চারী করছেন ভেবে পান না মিসেস হুদা। অবাক লাগছে তার কাছে।

অবশ্য মালামাল লুট হওয়ার দরুন আজ কদিন হতে মিঃ হুদা ভীষণ চিন্তিত ছিলেন কিন্তু তাঁকে এমনভাবে উদভ্রান্ত দেখায়নি। আজ যেন কেমন লাগছে

তাকে। স্ত্রী মিসেস হুদা স্বামীর সঙ্গে জেগে রয়েছেন, কারণ মিঃ হুদা এভাবে কক্ষের মেঝেতে পায়চারি করবেন আর তিনি ঘুমাবেন তা হয় না।

মিঃ হুদা ক্রুদ্ধকণ্ঠে বললেন—-যখন ঘুমাবার সময় হবে তখন ঘুমাবো। তুমি ঘুমাও।

এরপর মিসেস হুদা কোন কথা বলতে সাহসই পেলেন না, তিনি কিছুক্ষণ চেয়ারে বসে ভাবতে লাগলেন এবং স্বামীকে রক্ষা করে চললেন।

তারপর এক সময় শয্যা গ্রহণ করলেন তিনি।

হঠাৎ হাসির শব্দে তন্দ্রা ছুটে গেলো মিসেস হুদার।

মিঃ হুদা বিস্ময়করভাবে হাসছেন। তারপর তিনি হাসি বন্ধ করে স্ত্রীকে লক্ষ্য করে বললেন–তুমি ঘুমাও, আমি চলে যাচ্ছি। কোথায় যাচ্ছি তোমরা কেউ তা জানো না বা জানবে না।

স্বামীর কথাগুলোয় মিসেস হুদার চোখের ঘুম বিদূরিত হয়ে গেলো, শয্যায় উঠে বসে বললেন তিনি–জানি তুমি এবার পালাবার ফন্দি আঁটছো। প্রথম থেকেই আমি বলেছিলাম অসৎ উপায়ে অর্থ উপার্জন করতে যেও না। তাতে সুফল কোনোদিন হবে না, কারণ অন্যায়ভাবে উপার্জিত অর্থ কোনো সময় থাকে না, কোনো না কোনো ভাবে ধ্বংসপ্রাপ্ত হবেই সেই পাপার্জিত অর্থের বিনিময়ে গড়া ধনসম্পদ।

গম্ভীর কণ্ঠে গর্জে উঠলেন মিঃ হুদা–তুমি ভাবছো ধনসম্পদের কথা আর আমি ভাবছি আমার জীবন নিয়ে। আমিই হত্যা করেছি মিঃ আহম্মদকে……

তুমি! তুমি তাঁকে হত্যা করেছো? তুমি না তার বন্ধুলোক ছিলে? হ্যাঁ, এবার বুঝেছি কেন তুমি সব সময় জেগে কিংবা ঘুমিয়ে তাঁর নাম উচ্চারণ করতে। সব এবার আমার কাছে পরিষ্কার হয়ে গেছে। কি নিষ্ঠুর নরপশু তুমি……

কি বললে, আমি নরপশু! আঃ! কি সুন্দর কথা……আমি নরপশু…..স্ত্রী বলে তুমি আমার হাতে ক্ষমা পাবে না খালেদা।

কি করবে তুমি তোমার পাপময় জীবনের সঙ্গে জড়িয়ে আমি নিজেও পাপী হয়ে পড়েছি। আমি সব কথা বলে দেবে এবার সবার কাছে……

বলে দেবে? সে সুযোগ আর তুমি পাবে না খালেদা। দুহাত প্রসারিত করে মিসেস খালেদার দিকে এগিয়ে যান মিঃ হুদা। পকেট থেকে রুমালখানা বের করে জড়িয়ে নেন হাতে, তারপর বলেন–যে ভাবে আমি মিঃ আহম্মদকে পৃথিবীর বুক থেকে সরিয়ে দিয়েছি সেইভাবে তোমাকেও মুছে ফেলবো পৃথিবীর বুক থেকে… স্ত্রী বলে তুমি ক্ষমা পাবে না। আমি নরপশু! হাঁ, ঠিকই বলেছো আমি পশুই বটে… মিঃ হুদা এগিয়ে যান শয্যার পাশে। দুহাতে তার রুমাল জড়ানো। চোখ দিয়ে যেন আগুন ঠিকরে বের হচ্ছে।

মত্যুর পূর্বমহর্তে মানুষ নির্ভীক এবং ভয়ংকর হয়ে ওঠে। মিসেস হুদাও তেমনি ভয়ংকর হয়ে উঠলেন, তিনি বললেন–আমাকে তুমি হত্যা করে নিষ্কৃতি পেতে চাও, তা পাবে না। তোমার পাপ তোমাকে গ্রাস করবে। তুমি পাপে পাপে তলিয়ে গেছে। অর্থ আর ঐশ্বর্য তোমাকে উম্মাদ করে তুলেছে। তুমি সব পারো।

তবু কথা বলছো? মিঃ আহম্মদ শুধু বলেছিলো পাপ তুমি করো না হুদা। পাপে অর্জিত অর্থ স্থায়ী হয় না। আমি তোমার সব জেনে ফেলেছি। তোমাকে সাবধান করে দিলাম তুমি অসৎ ব্যবসা বর্জন করে। কিন্তু তার পরিণাম কি হলো? প্রাণটা হারালো সে পিপড়ার মত। তুমিও আজ রেহাই পাবে না আমার হাত থেকে….।

মিঃ হুদা এবার মিসেস খালেদাকে ধরে ফেলেন, তারপর দুহাতে টিপে ধরেন তার গলা।

মিসেস খালেদার জিভটা বেরিয়ে আসে। চোখ দুটো ঠিকরে বেরিয়ে আসছে। আর এক মুহূর্ত, তাহলে স্থির হয়ে যাবে তার দেহটা।

মিঃ হুদার চোখেমুখে হিংস্র ভয়ংকর ভাব ফুটে উঠেছে। তা এ মুহূর্তে একটি জানোয়ার ছাড়া কিছু মনে হচ্ছে না।

মিসেস খালেদা হুদার মুখ থেকে একটা গোঁ গোঁ শব্দ বেরিয়ে আসে।

মিঃ হুদার হাত দুখানা আরও জোরে চাপ দিচ্ছে।

মিসেস হুদা শয্যায় পড়ে গেছেন।

ঠিক সেই মুহূর্তে নূর এবং তার সঙ্গে পুলিশপ্রধান মিঃ হারুন এবং কয়েকজন সশস্ত্র পুলিশ কক্ষে প্রবেশ করে।

নূর এবং মিঃ হারুন সর্বাগ্রে। তাঁদের হাতের রিভলভার উদ্যত করে ধরা হয়েছে মিঃ হুদাকে লক্ষ্য করে।

মিঃ হারুন বললেন–মিঃ হুদা, আপনার আসল রূপ প্রকাশ পেয়েছে। ছেড়ে দিন তাঁকে।

মিঃ হুদা পদশব্দেও তার হাত দুখানা সরিয়ে নেননি স্ত্রীর গলা থেকে। এবার মিঃ হুদা বাধ্য হলেন মিসেস হুদার গলা থেকে হাত সরিয়ে নিতে। তারপর সোজা হয়ে দাঁড়িয়ে ভালভাবে তাকালেন তিনি মিঃ নূর, মিঃ হারুন এবং সশস্ত্র পুলিশদের দিকে।

তাঁর দুচোখে হিংস্রভাব ফুটে উঠেছে। দাঁতে দাঁত পিষে বললেন–আপনারা কার হুকুমে এখানে এলেন? কেমন করে এলেন জানতে চাই?

হো হো করে হেসে উঠলেন মিঃ হারুন, তিনি মুহূর্তে যেন পাল্টে গেলেন। হাসি থামিয়ে ক্রুদ্ধকণ্ঠে বললেন–মিঃ আহমদকে হত্যা করে আপনার মাথায় হত্যার নেশা চেপেছে। আপনার স্ত্রীকে আপনি এ মুহূর্তে হত্যা করতে যাচ্ছিলেন। ভাগ্যিস আমরা ঠিক সময় এসে পড়েছি তাই মিসেস হুদা রক্ষা পেলেন নইলে এতক্ষণে তিনি শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করতেন।

মিসেস হুদা তখন শয্যায় বসে গলায় হাত বুলাচ্ছেন। তার চুল এলোমেলো, আঁচল খসে পড়েছে খাটের নিচে। মৃত্যুর পূর্বমুহূর্তে মানুষের যে অবস্থা হয় ঠিক তেমনি হয়েছে মিসেস হুদার। তিনি গলায় হাত বুলিয়ে নিচ্ছিলেন এবং পুলিশের ড্রেস পরিহিত লোকগুলোর কথা দুচোখ বিস্ফারিত করে শুনছিলেন।

এবার মিঃ হারুন বললেন–আমরা আপনার কক্ষের বাইরে দাঁড়িয়ে সব শুনেছি। আপনি শুধু চোরাকারবারীই নন আপনি প্রখ্যাত পুলিশ সুপার মিঃ আহম্মদের হত্যাকারীও। তা ছাড়াও আপনি নিজ স্ত্রীকেও হত্যা করতে যাচ্ছিলেন। কাজেই আপনাকে আমরা এ্যারেষ্ট করলাম। মিঃ হারুন একজন পুলিশ অফিসারকে ইংগিত করলেন মিঃ হুদার হাতে হাতকড়া পরিয়ে দিতে।

মিঃ হুদা রিভলভারের মুখে একটি কথাও বলতে পারলেন না। তিনি কটমট করে তাকাতে লাগলেন নুরের দিকে। মিঃ হুদা ঠিকই অনুধাবন করতে সক্ষম হয়েছেন, হারুন এবং পুলিশ বাহিনীকে তার বাসভবনে নিয়ে এসেছে নূর, কারণ নূরই প্রথম তাকে খুনী হিসেবে আবিষ্কার করেছে। শুধু আবিষ্কার নয় তার কথাগুলো টেপ করে নিয়েছিলো সে।

মিঃ হারুন নূরের করমর্দন করে বলেন–মিঃ নূর, আপনাকে অনেক ধন্যবাদ, আপনি সুকৌশলে মিঃ আহম্মদের হত্যাকারীকে খুঁজে বের করেছেন।

একটু হাসলো নূর।

মিসেস হুদা ততক্ষণে উঠে দাঁড়িয়েছেন। তিনি বললেন–আমার জীবন রক্ষার জন্য আমিও ধন্যবাদ জানাচ্ছি আপনাদের। আমার স্বামীকে আমি বহুদিন সৎপরামর্শ দিয়েছি। অসৎ ব্যবসা থেকে তাঁকে বিরত থাকতে বলেছি যার জন্য তিনি আজ আমাকে হত্যা করতে গিয়েছিলেন। আজ আমি খুশি হয়েছি যে তার পাপের প্রায়শ্চিত্ত তিনি পেলেন। আমার কোনো দুঃখ নেই আমি খুশি হয়েছি।

মিঃ হুদার দুচোখ দিয়ে আগুন ঝরছে যেন। স্ত্রীর দিকে ক্রুদ্ধ দৃষ্টি নিয়ে তাকালেন।

নূর বললো–স্যার, এবার ফেরা যাক।

মিঃ হারুন বললেন–হাঁ, চলুন মিঃ নূর।

মিঃ হুদার হাত দুখানায় হাতকড়া লাগানো। পুলিশ ভ্যানে তাকে তুলে নেওয়া হলো।

*

নূর, শুনলাম কান্দাইয়ে সবচেয়ে ধনকুবের মিঃ হুদাকে তুই গ্রেপ্তার করেছিস? পুত্রের মুখের দিকে তাকিয়ে বললো মনিরা।

হেসে বললো নূর–আল্লাহ আমাকে সাহায্য করেছিলেন তাই আমি এত সহজে এ ব্যাপারে সফল হতে পেরেছি আম্মু।

কাজটা কি ভাল করলি নূর?

কেন?

শুনেছি ধনকুবের মিঃ হুদা ভয়ংকর লোক। তার বহু জাদরেল অনুচর আছে। যাদের অসাধ্য কিছু নেই।

হাঁ আম্মু, তোমার কথা সত্য।

তাহলে……

আম্মু, এসব ভয় করলে কোনো কাজ করতে সক্ষম হবে না। জানো আম্মু এই নরপশুটাকে এত সহজে আবিষ্কার করবো ভাবতে পারিনি। অত্যন্ত চতুর এই নরপশুটা। নিজের স্ত্রীকে সে হত্যা করতে গিয়েছিলো, আর এক মুহূর্ত বিলম্ব হলে বেচারী মিসেস হুদা মৃত্যুবরণ করতেন।

সত্যি?

হাঁ আম্মু, মিঃ হুদা ধনকুবের হলে কি হবে, তার অর্থের লালসা তাকে পশু করে তুলেছে। অসহায় মানুষের রক্ত আজ তার ঐশ্বর্যের ইমারত গড়ে উঠছে। তার প্রাচুর্যের সীমা নেই। তবু আরও লালসা কেমন করে আরও অর্থ আসবে।

শুনেছি তার নাকি অনেকগুলো ইন্ডাস্ট্রি রয়েছে?

হাঁ, এ সব ইন্ডাস্ট্রি তার অসৎ উপায়ে অর্জিত অর্থের প্রতীক। হাজার হাজার নিঃসম্বল, অসহায় শ্রমিক তার এসব ইন্ডাস্ট্রিতে মাথার ঘাম পায়ে ফেলে দিনরাত কাজ করে অথচ তাদের কারও পেটে ভাত নেই পরনে কাপড় নেই। অসুখে ধুকে ধুকে মরছে, ওষুধ নেই। জানো আম্মু এদের নিঃশেষ করে মিঃ হুদা গড়ে তুলেছে তার ঐশ্বর্যের পাহাড়। একটু থেমে বললো নূর–বড় আফসোস্ এই ধরনের ব্যক্তিরাই আজ পৃথিবীর সেরা মানুষ, স্বনামধন্য ব্যক্তি, তারাই নেতৃস্থানীয়।

কি জানি আমার আশংকা জাগে মনে এরা শুধু নেতৃস্থানীয় নয়, এরা হিংস্র জন্তুর মত ভয়ংকরও বটে।

ঠিক বলেছো আম্মু, এদের দৌরাত্ম্যে দেশবাসী অতিষ্ঠ কিন্তু কিছু বলতে পারে না তারা কারণ নিরীহ মানুষগুলো যে ওদেরই মুখোপক্ষী। জানো আম্মু, মিঃ হুদাকে কত কৌশলে আমি পাকড়াও করতে পেরেছি?

খুলে না বললে আমি কেমন করে জানবো। যদি বলি না হলে না হয় জানতে পারি।

আজ নয় আর একদিন সব বলবো। আজ জরুরি কিছু কাজ আছে আম্মু।

নূর জামাটা তুলে নেয় হাতে।

মনিরা সন্তানের হাত থেকে জামাটা নিয়ে পরিয়ে দেয়, তারপর চিরুনী দিয়ে মাথার চুলগুলো আঁচড়ে দেয়।

নূর হেসে বলে–এখনও বুঝি কচি খোকাটি রয়েছি আম্মু!

হাসে মনিরা।

নূর বলে–আম্মু, আমি ফিরে না আসা পর্যন্ত যেওনা যেন!

বলে মনিরা–তাড়াতাড়ি ফিরে এসো।

আচ্ছা।

নূর বেরিয়ে গেলো।

সিঁড়িতে জুতোর শব্দ মিশে গেলো ধীরে ধীরে।

মনিরা বিছানাটা পরিপাটি করে গুছিয়ে ফিরে দাঁড়াতেই চমকে উঠলো, বুকটা আনন্দে টিপ টিপ করে উঠলো, বললো সে–তুমি!

হাঁ

তুমি বেঁচে আছে তাহলে?

ভেবেছিলে মরে গেছি।

সত্যি তুমি বড় হৃদয়হীন।

এ কথা তোমার মুখে বহুবার শুনেছি তবু আরও শুনতে ইচ্ছা করে। যাক্ ছেলে তোমার বড় আদরের ধন, ওকে পেয়ে বেশ আছো?

কেন, হিংসে হচ্ছে তোমার?

হয় বৈকি। শোনো মনিরা, তোমার ছেলে এখন আর ছোট বা অবুঝ নেই। সে মস্তবড় ডিটেকটিভ হয়েছে। পুলিশ ডিটেকটিভরা যা পারেন নি তোমার নূর তা পেরেছে।

মনিরা স্বামীর বুকে মাথা রেখে বললো–তোমার সন্তান বলেই তো ওর এত বুদ্ধি।

বনহুর মনিরাকে গভীর আবেগে কাছে টেনে নিলো। বললো–সত্যি তোমাকে এখানে পাবো ভাবতে পারিনি।

ছিঃ ছাড়ো। নূর এসে পড়বে।

জানি ও এখন আসবে না। তা ছাড়া মোহসীন বাজারে গেছে, দাবোয়ান গেটে বসে বসে ঝিমুচ্ছে।

এখানে এলে কেমন করে?

নূরকে জিজ্ঞাসা করছো। তুমি তো জানো তোমার স্বামীর অসাধ্য কিছু নেই। মনে নেই তোমার জন্মদিনে তোমার মামার হীরার আংটি যা তিনি তোমাকে উপহার দিয়েছিলেন তা তোমার আংগুল থেকে তোমার অজ্ঞাতে.....

মনিরা স্বামীর মুখে হাতচাপা দিয়ে বলে–ওসব কথা থাক। বলো কোথায় ছিলে এতদিন?

সে এক অদ্ভুত কাহিনী মনিরা, শুনলে তুমি অবাক হবে।

সবই তো বিস্ময়কর আর অদ্ভুত যা তোমার জীবনে ঘটে। যেমন তুমি অদ্ভুত মানুষ তেমনি.....

মনিরা, মা কেমন আছেন?

মায়ের কথা মনে আছে তোমার?

সত্যি বড় হতভাগা আমি। কথাটা বলে একটা দীর্ঘশ্বাস ত্যাগ করলো বনহুর।

মনিরা স্বামীর জামার বোতামটা লাগিয়ে দিতে দিতে বলে–এমনি করে চিরকাল কাটিয়ে দেবে? কখন কোন্ বিপদ তোমার জীবনে নেমে আসবে কে জানে!

আমাকে নিয়ে তোমাদের কত দুশ্চিন্তা, কত ভাবনা। আর আমি তোমাদের কাউকেই সুখী করতে পারলাম না।

ছিঃ অমন কথা বলো না। তোমাকে পাওয়া এ যে আমার জীবনের পরম সৌভাগ্য।

মনিরা, তোমরা যত কথাই বলো আমার কাছে লুকোতে পারবে না। জানি তোমাদের ব্যথা বেদনা তবুও পারি না তোমাদের পাশে থাকতে।

কেন পারোনা? তুমি কি মানুষ নও?

মনিরা, ইচ্ছে হয় আর তোমাদের ছেড়ে কোথাও যাবে না। মায়ের কোলে মাথা রেখে ঘুমাবো, তোমাকে পাশে পাবো। নূরকে দেখতে পাবো সর্বক্ষণ, কিন্তু……

কিন্তু কি বলো? বলো কিন্তু কি?

একটু তোমাদের মাঝে হারিয়ে যেতে চাই মনিরা।

তবে কেন পারোনা?

জানি না কেন যে পারি না। কতকগুলো অসহায় করুণ মুখ আমাকে হাতছানি দিয়ে ডাকে।

তারাই কি তোমার আপন জন?

মনিরা, এ প্রশ্ন করো না। তুমি তো জানো ওরা আমার কতখানি। তবু কেন বারবার এ প্রশ্ন করো?

ওগো, তুমি বুঝবে না আর বুঝতে পারো না বলেই তুমি দূরে সরে যেতে পারো। কত ব্যথা আর বেদনা নিয়ে দিন কাটাই....

এসব বলে তুমি আমাকে কষ্ট দাও কেন মনিরা। আমি জানি তোমরা আমার জন্য সর্বক্ষণ অপেক্ষা করো, আমি হতভাগ্য তাই পারি না তোমাদের মধ্যে ছুটে আসতে।

কেন তুমি পারোনা? জবাব দাও?

এ প্রশ্নের জবাব কোনোদিনই দিতে পারবো না। চলো মনিরা, তোমাকে বাসায় পৌঁছে দিই।

নূর এসে আমাকে না দেখতে পেলে কি ভাববে বলে তো? নূরের জন্য তোমার কি একটুও ভাবনা হয় না?

একটু হেসে বলে বনহুর–ও তো এখন মস্তবড় ডিটেকটিভ। ওর জন্য আমার বা তোমার। ভাবতে হবে না। ও নিজেই নিজেকে সামলে নিতে পারবে।

বাংলার বেলকুনিতে এসে দাঁড়ালো বনহুর আর মনিরা। নূর এখানে বসে বসে ডায়রী লেখে, ভাবনা চিন্তা করে কখনও রাতে কখনও বা দিনে দিনের বেলায় ফুরফুরে হাওয়া মন এবং শরীর দুটোকেই জুড়িয়ে দেয়। আবার রাতে জোছনার আলো লুটোপুটি খায় বেলকুনিতে। ওদিকে নদী, বেলকুনি থেকে নদী দেখা যায়। মাঝে মাঝে ছিপ নৌকায় মাঝিরা মাছ ধরে। কখনও বা সওদাগরদের বড় বড় পানসী নৌকা পাল তুলে চলে যায় এদিক হতে সেদিকে।

নূর চিন্তামগ্ন হলে, কেউ তাকে এদিকে বিরক্ত করতে আসে না। প্রচুর ভাবনার সময় পায় সে নিরিবিলি।

বেলকুনির নিচেই বাগান।

নানা ধরনের ফুল ফুটে থাকে বাগানটাতে। হাস্নাহেনা গন্ধ ছড়ায় বাতাসে। কখনও বা রজনীগন্ধা স্নিগ্ধ গন্ধ নূরকে অভিভূত করে।

আজ এই বেলকুনিতে এসে দাঁড়ালো ওরা দুজন বনহুর আর মনিরা।

পূর্ণিমা রাত।

বেলা ডোবার সঙ্গে সঙ্গে পূর্বাকাশ জুড়ে রূপালি থালার মত পূর্ণিমার চাঁদ ভেসে ওঠে। জোছনার আলোতে ভরে ওঠে বেলকুনিটা।

স্নিগ্ধ আলোতে বনহুর দাঁড়িয়ে মনিরার পাশে।

দুজন তাকিয়ে থাকে দুজনের দিকে।

জমকালো পোশাকে বনহুরকে অদ্ভুত সুন্দর লাগছে। আংগুলে সিগারেট, মুখে মৃদু হাসির আভাস।

বনহুর বেলকুনিতে হেলান দিয়ে দাঁড়িয়ে ছিলো।

এ পাশে সম্পূর্ণ নির্জন।

কেউ হঠাৎ এসে পড়লেও দেখতে পাবে না সহজে।

মনিরা বনহুরের দিকে নির্ণিমেষ চোখে তাকিয়ে বলে–প্রাণভরে তোমাকে দেখার সাধ মেটে না আমার।

তুমি বড় ছেলে মানুষের মত কথা বলো মনিরা। এই তো আমি এসেছি তোমার পাশে।

ক্ষণিকের জন্য তুমি এসেছো আবার চলে যাবে। যেমন করে চাঁদ মেঘের আড়ালে লুকোচুরি খেলে তুমিও তাই……

মনিরা।

সত্যি কি তুমি এখন ওসব ত্যাগ করতে পারোনা?

কেমন?

যেমন আর সবাই সংসার করে।

মনিরা, তুমি তো সব জানো আর দশজনের মত আমি নই, কারণ আমি পারি না তোমাদের মন খুশি করতে। আমাকে তোমরা অভিসম্পাত করো মনিরা।

থাক এই জোছনাভরা রাতে তোমার করুণ অভিনয় আমি দেখতে চাই না মনির। তুমি এসেছে এ আমার শুধু পরম ভাগ্য নয়, আমার জীবনের এক পরম মুহূর্ত।

মনিরার মুখের দিকে বিস্ময়ভরা দৃষ্টি নিয়ে তাকালো বনহুর, কারণ একটু পূর্বেই মনিরার কণ্ঠে ছিলো একটা গভীর অভিমানের সুর। এক্ষণে সেই অভিমানভরা সুরের আভাস আর নেই তার গলায়।

বনহুরের মনটা সচ্ছ হয়ে এলো।

মনিরার একখানা হাত সে মুঠায় তুলে নিলো। দক্ষিণ হাতের আংগুলে অর্ধদগ্ধ সিগারেট ছিলো, সেটা রেখে দিলো বনহুর এ্যাসট্রের মধ্যে।

ঠিক ঐ সময় সিঁড়িতে জুতার শব্দ শোনা গেলো বনহুর বুঝতে পারলো নূর আসছে এবং তার সঙ্গে আরও কেউ আছে বলে মনে হলো, কারণ সিঁড়িতে একা নূরের জুতার শব্দ নয়–আরও একজোড়া জুতার শব্দ শোনা যায়। নূর কারও সঙ্গে কথা বলতে বলতে উঠে আসছে। এমন কেউ যার গলা অপরিচিত বলে মনে হচ্ছে।

বনহুর বললো–এবার আমাকে যেতে হয় মনিরা। চলি আবার আসবো।

চলে যাবে?

নূরের সঙ্গে এমন কেউ আসছে যে আমাকে বন্ধু মনে না করে শত্রু মনে করতে পারে। তাছাড়া আমাকে চিনে ফেলতে পারে..

এর বেশি আর বিলম্ব করার সময় ছিলো না বনহুরের। সে দ্রুত রেলিং টপকিয়ে আড়ালে চলে গেলো।

শোনা গেলো নূরের গলার আওয়াজ–আম্মু, আম্মু তুমি কোথায়? এই দেখো কাকে ধরে এনেছি……

মনিরা চট করে জবাব দিতে পারলো না।

ততক্ষণে এসে গেছে নূর এবং নূরের বন্ধু আরমান। একই সঙ্গে ওরা বিদেশে ছিলো, নূর গোয়েন্দা বিভাগে পড়াশোনা করেছে আর আরমান করেছে মনোবিজ্ঞান নিয়ে। একই হোষ্টেলে থাকতো ওরা, খুব ভাব ছিলো ওদের মধ্যে।

নূর ও আরমান ভাল ছাত্র ছিলো তাই হয়তো দুজনের মধ্যে ছিলো গভীর একটা সম্বন্ধ।

উভয়েই পাশ করে যখন ফিরে এলো তখন নূর একজন দক্ষ ডিটেকটিভ আর আরমান একজন মনস্তত্ত্ববিদ। উভয়েই এরপর নিজ নিজ কাজে মনোযোগ দিয়েছিলো।

বড় একটা দেখা–সাক্ষাৎ হতো না তাদের মধ্যে।

কান্দাই মহাদেশ না হলেও একটি বড় দেশ। যার মধ্যে রয়েছে অনেকগুলো বিভাগ। কাজেই নূর আর আরমান ছাড়াছাড়ি বিদেশ থেকে ফেরার পর হতেই।

হঠাৎ আজ মিঃ আহম্মদের হত্যা তদন্ত নিয়ে মিঃ শংকর রাওয়ের বাংলোয় দেখা করতে গেলে দেখা হয় আরমানের সঙ্গে।

অনেকদিন পর দেখা–সাক্ষাৎ, কাজেই নূর ছাড়তে পারে না আরমানকে। ধরে নিয়ে আসে নিজের বাংলোয়। বলে, আম্মু এসেছেন আমার বাংলোয়, চলো আরমান তোমার সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দেবো আম্মুর।

নূরের কাছে তার আম্মুর অনেক গল্প শুনেছে। মাকে বড় ভালবাসে নূর। তার আম্মুর কথা ছাড়া আর কিছুই যেন বলবার ছিলো না নূরের। তাই ইচ্ছা করেই আরমান নূরের সঙ্গে চলে এলো কোনোরকম আপত্তি না করেই।

নূর আর আরমান যখন সিঁড়ি বেয়ে উপরে উঠে এলো তখন মনিরা বেলকুনিতেই দাঁড়িয়ে ছিলো।

হলঘরের পেছন দিকেই এই বেলকুনি, রেলিংঘেরা সুন্দর কারুকার্য খচিত।

নূর আর আরমান এসে পড়লো এ ধারে।

মাকে হলঘরে না পেয়ে নূর বেলকুনিতে চলে এলো।

মনিরা বললো–এই তো আমি এখানে।

নূর হেসে বললো–আম্মু আমার বন্ধু আরমানকে সঙ্গে নিয়ে এসেছি। তোমার মনে আছে যার কথা তোমাকে চিঠিতে লিখতাম?

হাঁ, মনে আছে।

নূর আরমানকে বললো–আরমান....ইনি আমার আম্মু।

সালাম দিলো আরমান মনিরাকে।

মনিরা বললো–বসো তোমরা।

পাশাপাশি কয়েকখানা সোফা রয়েছে, সামনে একটা টেবিল।

মনিরার কথায় ওরা দুজন আসন গ্রহণ করলো।

আরমান বললো–ভারী সুন্দর জোছনা।

নূর হঠাৎ চমকে উঠলো–এ্যাসট্রের মধ্যে গোঁজা ধূমায়িত অর্ধদগ্ধ সিগারেট। সিগারেট এলো কোথা থেকে? কে এসেছিলো এখানে?......বিস্ময় নিয়ে নূর তাকালো মনিরার মুখের দিকে। পরমুহূর্তেই উঠে দাঁড়িয়ে বললো–চলো আরমান, ঘরে গিয়ে বসি। এসো আম্মু।

আরমান বললো–এখানেই তো বেশ আছি।

না, ঘরে চলো। নূর বিলম্ব না করে হলঘরে প্রবেশ করে আসন গ্রহণ করলো।

তারপর চললো নানারকম কথাবার্তা।

রাত বেড়ে আসছে।

মনিরা বললো–ছেলের বন্ধু, তুমি আমার ছেলের মত, কাজেই না খেয়ে যেতে দেবো না।

মনিরা রান্নাঘরের দিকে চলে গেলো।

নূর আর আরমান ফিরে গেলো তাদের বিগত দিনগুলোতে।

গল্প করছিলো তারা।

নূর মাঝে মাঝে অন্যমনস্ক হয়ে পড়ছিলো। তার মনে নানা রকম চিন্তার উদ্ভব হচ্ছিলো, আম্মু একা দাঁড়িয়ে ছিলেন বেলকুনিতে অথচ টেবিলের এ্যাসট্রের মধ্যে জ্বলন্ত সিগারেটের টুকরা। কোথা থেকে এই অর্ধদগ্ধ সিগারেটের টুকরাটি এলো? কে এসেছিলো?

হেসে বলে আরমান–নূর, তোমাকে হঠাৎ বড় অন্যমনস্ক লাগছে, ব্যাপার কি বলোতো

নূর আরমানের কথায় সজাগ হয়ে ওঠে বলে– না না কিছু না। ভাবছিলাম মায়ের কথা।

সত্যি নূর, তুমি বড় সুখী। সব সময় মাকে পাশে পাচ্ছো, তার আদর যত্ন পাচ্ছো।

তা সত্য কিন্তু মা তো আমার কাছে থাকেন না।

তবে তিনি কোথায় থাকেন?

বাড়িতে…মানে আমাদের নিজের বাড়ি……

ও!

মাকে আবার রাতেই রাখতে যেতে হবে।

কেন, তিনি থাকবেন না বুঝি?

আম্মু থাকেন না তবে আসেন প্রায়ই। সময় অসময় আম্মুর কাছে কিছু নেই।

ছেলের বাড়ি আসবো তার আবার সময়–অসময় কি বলো তো? কথাটা বলতে বলতে মনিরা প্রবেশ করলো সেখানে। একটু থেমে বললো–চলো তোমরা টেবিলে

খাবার খেতে দিয়েছি।

আরমান আর নূর উঠে পড়লো।

খাবার ঘরে সুন্দরভাবে সাজানো নানারকম খাবার।

আরমান খেতে খেতে বললো–অনেকদিন পর এমন সুন্দর খাবার পেটে পড়লো।

বললো নূর–আম্মু এলেই নানারকম খাবার তৈরি করেন।

নানা ধরনের কথাবার্তার মধ্য দিয়ে খাওয়াপর্ব শেষ হলো।

আরমান বিদায় গ্রহণ করলে এক সময়।

রাত বেশ বেড়ে গেছে।

নূর বললো–চলো আম্মু, তোমাকে রেখে আসি?

চল। রাত অনেক হয়েছে, নিশ্চয়ই তোর দাদীমা, ভাবছেন।

আচ্ছা আম্মু, আমি যখন ফিরে এলাম আরমানকে নিয়ে তখন তুমি বেলকুনিতে দাঁড়িয়ে। আমি লক্ষ করেছি টেবিলের এ্যাসট্রের মধ্যে ধূমায়িত অর্ধদগ্ধ সিগারেটের টুকরা যা থেকে তখনও ধুয়া নির্গত হচ্ছিলো।

মনিরার মুখমন্ডল রক্তাভ হয়ে উঠলো।

কক্ষের আলোতে স্পষ্ট দেখা গেলো মনিরা সন্তানের সামনে নিজকে বিব্রত বোধ করছে।

কোনো জবাব দিলো না মনিরা।

নূর বললো–চলো আম্মু।

মনিরা নীরবে অনুসরণ করলো নূরকে।

গাড়িতে বসে মা ও সন্তানের মধ্যে কোনো কথা হলো না।

আম্মাকে বাসায় পৌঁছে দিয়ে ফিরে এলো নূর।

কক্ষে প্রবেশ করতেই দামী সিগারেটের গন্ধ নাকে প্রবেশ করলো। তাড়াতাড়ি সুইচ টিপে আলো জ্বাললো নূর। আশ্চর্য হলো সে কেউ তার চেয়ারে বসে সিগারেট পান করছে।

নূর সুইচ টিপে আলো জ্বালায়, সঙ্গে সঙ্গে বলে উঠলো—কে

চেয়ার ছেড়ে আগন্তুক উঠে দাঁড়ালো।

নূর বিস্ময়ভরা কণ্ঠে বললো–আব্বু তুমি!

বনহুরের মুখে একটা শান্ত হাসির আভাস ফুটে উঠেছে, বললো বনহুর–নূর, তোমার আম্মুকে যে প্রশ্ন করেছিলে তার জবাব আমি দিচ্ছি। ঐ সিগারেট আমিই ভুল করে এ্যাসট্রের মধ্যে খুঁজে সরে গিয়েছিলাম।

আমি তা বুঝতে পেরেছি। তা, হঠাৎ তোমার আগমন আমার বাংলোয় কোন্ উদ্দেশ্যে আব্বু।

নূর, তোমার সঙ্গে বিশেষ জরুরি কথা আছে। হঠাৎ এসে দেখলাম তোমার আম্মু এখানে, কয়েকটা কথা তার সঙ্গে হলো। তার কথায় জানলাম তোমার ওপর তার দৃঢ় বিশ্বাস জন্মেছে তুমি তার কথামত সব কাজ করো।

হাঁ, আম্মুকে আমি শ্রদ্ধা করি সবচেয়ে বেশি।

খুশি হলাম নূর। একটু থেমে বললো বনহুর–তুমি তো জানো তোমার আম্মুর মনে অনেক দুঃখ–ব্যথা, কাজেই তার দিকে তোমার খেয়াল রাখা একান্ত দরকার।

একটু পূর্বে নূরের মনে যে প্রশ্ন বারবার খোঁচা দিচ্ছিলো এখন তা পরিষ্কার হয়ে গেলো। তাহলে আল্লু অনেকক্ষণ এসেছেন।

নূর বসো। গম্ভীর কণ্ঠে বলল বনহুর।

নূর তাকালো বনহুরের মুখের দিকে, সে মুখে নেই কোনো রাগ বা অভিমানের ছাপ। বাধ্য ছাত্রের মত আসন গ্রহণ করলো নূর। কিছুক্ষণ পূর্বে যখন আম্মুকে সে অর্ধদগ্ধ সিগারেট সম্বন্ধে প্রশ্ন করেছিলো তখন আম্মু নিশ্চুপ ছিলো। তার আব্বু তাহলে আড়াল থেকে সব শুনেছেন। নূর কথাটা ভেবে লজ্জা পাচ্ছিলো মনে মনে।

বনহুর তার আংগুলের ফাঁকে সিগারেটটা এ্যাসট্রের মধ্যে খুঁজে রেখে বললো–নূর, তোমার সুন্দর বুদ্ধির জন্য তোমাকে অনেক ধন্যবাদ কারণ তুমি মিঃ আহম্মদের হত্যাকারীকে সুকৌশলে খুঁজে বের করেছে। মিঃ হুদা শুধু অসৎ ব্যক্তিই ছিলো না, তার কুমতলব ছিলো অনেক। যাক সে সব কথা, শোন নূর।

নূর তার চোখ দুটো তুলে ধরলো বনহুরের মুখের দিকে।

বনহুর বলে চলেছে–হুঁদার যে কয়েক ট্রাক মাল দেশের বাইরে পাচার হয়ে যাচ্ছিলো তা আমি। আটক করেছি।

এবার কথা বললো নূর–আমিও ঐ রকম অনুমান করেছিলাম।

হাঁ, তোমার অনুমান সত্য।

মালামালগুলো কোথায়? বললো নূর।

বনহুর পূর্বের মত স্থির শান্ত কণ্ঠে বললো–কান্দাই পর্বতের এক গোপন স্থানে আটক করে রাখা হয়েছে তবে দুট্রাক মাল সিমলা দুর্গত এলাকায় বিতরণ করে দেয়া হয়েছে।

আব্বু, তুমি নিশ্চয়ই জানো পুলিশ এ ব্যাপারে জোর তদন্ত চালাচ্ছে।

জানি এবং এ কারণেই তোমার সঙ্গে দেখা করা নিতান্ত দরকার মনে করেছি। নূর, তুমি জানো এ মালামাল দেশের দুঃস্থ মানুষদের মধ্যে বিলিয়ে দেয়া হবে। বহুদিন আমি দেশের বাইরে ছিলাম এ কারণে আমি জানতে চাই কান্দাইয়ের কোন স্থানে বা কোন এলাকায় এ মালামাল প্রদান করলে আমাদের শ্রম সার্থক হবে।

নূর বললো আব্বু, তোমার চেয়ে আমি বেশি জানি না তবে আমার মনে হয় এ মালামাল সরকারের নিকটে সমর্পণ করা ভাল।

একটু হেসে বললো বনহুর–নুর, তুমি নিশ্চয়ই জানো এ সব মালামাল যখন সরকারের দখলে চলে যাবে বা যায় তখন তার হদিস মেলা কঠিন। সে সব বস্তু কখন কোন পথে উধাও হয়ে যায় তার সঠিক সন্ধান কেউ জানো না। কাজেই আমি চাই না এ মালামাল সরকার গ্রহণ করুক বরং তুমি আমাকে সাহায্য করবে মালামালগুলো যেন সত্যিকারের সকাজে ব্যয় হয়। তুমিও কয়েক বার বস্তি এলাকায় গেছে, নিজ চোখে দেখেছো তাদের অবস্থা। যে ভাবে তারা এ সব এলাকায় বসবাস করে তেমন জায়গায় কোনো মানুষ বাস করতে পারে না।

হাঁ, তোমার কথা সত্য আব্বু।

পঁচা স্যাঁতস্যাঁতে একটু কাদাময় জায়গা। তারপর সামান্য জায়গার মধ্যে অগণিত মানুষ বাস করে। ছোট্ট চালাঘর, ঝড়–বৃষ্টি বাধা মানে না। মেঝে আর উঠোন একই অবস্থা। সব সময় তাই নানা ধরনের রোগ লেগেই থাকে। এমনভাবে মানুষ কি করে বেঁচে থাকে, সভ্য সমাজের মানুষ এদের কথা ভাবতেই পারে না।

নূর বললো–নিজেরা এসব জায়গায় না গেলে বোঝা যায় না এরা কি ভাবে বেঁচে আছে। আমি নিজে দেখেছি ডাষ্টবিন থেকে খাবার হাতড়ে নিয়ে খাচ্ছে এ সব বস্তি এলাকার অর্ধউলঙ্গ ছেলেরা। আমি দেখেছি পচা নর্দমায় জমে থাকা পানিতে এরা গোসল করছে। আরও দেখেছি বস্তির মেয়েরা ছেঁড়া চট পরে লজ্জা নিবারণ করছে আমাকে দেখে ওরা কুটিরে লুকিয়ে পড়েছে, সম্মুখে এসে কাপড় গ্রহণ করার কোনো উপায় ছিলো না ওদের।

তুমি যা বলছে এ সব আমার জানা এবং দেখা, কাজেই তুমি কি মনে করো মালামালগুলো এই ধরনের এলাকায় বিতরণ করে দেই?

হাঁ, তাই ভাল হয়। বললো নূর।

পুলিশমহলকে সামলানো তোমার দায়িত্ব।

শুনেছি মিঃ হারুন এ ব্যাপারে জোর তদন্ত চালিয়ে যাচ্ছেন। তোমাকেই তারা সন্দেহ করেছে।

জানি কিন্তু ওরা আমার কিছু করতে পারবে না। নূর, তুমি আমাকে সহায়তা করবে, কেমন?

তোমার প্রয়োজনমত আমাকে নির্দেশ করো, আমি তোমাকে জীবন দিয়ে সহায়তা করবো।

সাবাস! এর বেশি আমি তোমার মুখে কিছু শুনতে চাই না নূর। এবার তাহলে চলি?

তুমি এখন এসেছে, কিছু খেয়ে যাবে না?

আজ নয় এরপর যখন আসবো তোমার এখানে তখন খাবো।

কিভাবে যাবে তুমি?

কিছু ভেবোনা, অদূরে আমার গাড়ি অপেক্ষা করছে।

কথাটা বলে বেরিয়ে যায় বনহুর।

নূর দেখলো বনহুর সিঁড়ি বেয়ে নিচে নেমে গেলো, দারোয়ান তাকে গেট খুলে দিয়ে সরে দাঁড়ালো।

বুঝতে পারলো নূর, গেটে যে ব্যক্তি পাহারাদার হিসেবে ছিলো সে তার আসল দারোয়ান নয়। তাকে সরিয়ে বনহুর নিজের লোককে দারোয়ানরূপে দন্ডায়মান রেখেছিলো।

নূর ফিরে এলো শয্যার পাশে।

একটু হেসে আপন মনে বললো নূর–একজন বিশ্ববিখ্যাত দস্যুর সন্তান প্রখ্যাত ডিটেকটিভ......মন্দ নয়।

*

মিঃ হুদা বন্দী হলেও তার সহচরগণ আত্মগোপন করে কাজ চালিয়ে চললো। তাদের আক্রোশ গিয়ে পড়লো নূরের ওপর। মিঃ হুদার প্রধান সহকারী এবং ম্যানেজার হুয়াংহু ভীষণ কুচক্রী। সে তার কর্মচারীদের নির্দেশ দিলো অচিরে এক

গোপন বৈঠক করতে হবে এবং সেই বৈঠকে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতে হবে এখন আমাদের করণীয় কি?

এই বৈঠকে শুধু থাকবে তাদের নিতান্ত বিশ্বাসী লোকেরা।

একদিন বৈঠক হলো তাদের।

অত্যন্ত গোপনীয়ভাবে আলাপ–আলোচনা হলো। মিঃ আহম্মদের হত্যাকারী হিসেবে মিঃ হুদাকে বন্দী করা হয়েছে এবং তার বিচার চলছে।

প্রধান সহচর হুয়াংহু বললো–যেমন করে হোক সরিয়ে আনতে হবে মিঃ নূরকে। যে কৌশলে মিঃ হুদাকে মিঃ আহম্মদের হত্যাকারী হিসেবে গ্রেপ্তার করা হয়েছে সেইভাবে গ্রেপ্তার করতে হবে। প্রখ্যাত ডিটেকটিভ নূরকে। তাকে বন্দী করতে পারলেই বাস……তখন কৌশলে কার্যোদ্ধার করা যাবে।

নূর সেদিন বাসায় ফিরছিলো, হঠাৎ গাড়ির পেছন চাকায় কে বা কারা গুলী করলো। চাকা বার্স্ট হয়ে গাড়ি থেমে পড়লো, আর একটু হলেই গাড়িখানা উল্টে পড়তো।

নূর দেখলো কয়েকজন মুখোশধারী লোক তাকে ঘিরে ধরেছে। তার গাড়ির সম্মুখভাগে দাঁড়িয়ে একজন রিভলভারধারী, সে রিভলভার উদ্যত করে ধরে আছে।

একজন মুখোশধারী লোক গাড়ির দরজা খুলে ধরে চাপাকণ্ঠে বললো–নেমে আসুন।

বাধ্য হলো নূর গাড়ি থেকে নেমে আসতে।

একজন দ্রুত হস্তে নূরের নাকে পেছন হতে রুমাল চেপে ধরলো।

তারপর নূর জানে না কিছু।

যখন নূরের সংজ্ঞা ফিরে এলো তখন সে দেখলো এক আবছা অন্ধকার কক্ষে একটি শয্যায় শুয়ে আছে সে। তার চারপাশে দেয়ালে নানা ধরনের কলকজা এবং নানা ধরনের সুইচ রয়েছে।

বুঝতে পারলো নূর সে এখন বন্দী। সব কথা স্মরণ হলো ধীরে ধীরে। কিন্তু কোথায় এখন সে তা কিছুই অনুভব করতে পারছে না। কতক্ষণ সে এভাবে সংজ্ঞাহীন ছিলো তাও অনুধাবন করতে পারছে না।

শয্যায় উঠে বসলো নূর।

চারদিকে তাকিয়ে দেখতে লাগলো সে, বিস্ময়কর বটে।

হঠাৎ নূরের কানে এলে একটা শব্দ। বাইরে তালা খোলার শব্দ বলে মনে হলো। তবে কি তার সংজ্ঞা ফিরে এসেছে কিনা জানার জন্য কেউ আসছে?..

নূর তাড়াতাড়ি শুয়ে পড়লো, যেভাবে তাকে ওরা শুইয়ে রেখে গিয়েছিলো ঠিক সেইভাবে। দুচোখ বন্ধ করে রইলো নূর যেন কেউ বুঝতে না পারে তার সংজ্ঞা ফিরে এসেছে।

অলক্ষ্যে সব দেখতে লাগলো নূর।

কক্ষের তালা খুলে দুজন প্রবেশ করলো সেই কক্ষে। তাদের চেহারা ঠিক যমদূতের মত। একজনকে চিনলো নূর, সে হলো হুয়াংহু। একে সে মিঃ হুদার কারবারের ম্যানেজার হিসেবে দেখেছে। আর একজন সম্পূর্ণ অপরিচিত।

ওরা দুজন এসে দাঁড়ালো নূরের বিছানার পাশে।

নূর বুঝতে পেরেছে তার আম্মুর কথাই ঠিক হলো, তিনি সন্দেহ করেছিলেন মিঃ হুদার লোকজন ভীষণ দুষ্ট এবং ষড়যন্ত্রকারী, কাজেই নূরকে যে কোনো মুহূর্তে বিপদে ফেলতে পারে।

লোক দুজন এসে নূরের শয্যার পাশে দাঁড়িয়ে ভালভাবে লক্ষ করতে লাগলো, নূরের সংজ্ঞা এতক্ষণ ফিরে না আসার কারণ কি? ওরা নূরকে সংজ্ঞাহীন মনে করে আলাপ–আলোচনা করতে লাগলো।

মিঃ হুয়াংহুর সঙ্গী বললো–স্যার, একে খতম করে দিলে আর কোনো সমস্যা থাকবে না। বলুন শেষ করে দেই।

মিঃ হুয়াংহু সঙ্গীর কথায় বললো–লোরী, তুমি কিছু বোঝোনি। একে আটক করার পেছনে কারণ এবং মতলব আছে। ওকে দিয়েই আমরা আমাদের মালিক মিঃ হুদাকে মুক্ত করে আনবো।

স্যার, যদি ওকে জীবিত রাখা যায় তাহলে অসুবিধা হবে, কারণ প্রখ্যাত ডিটেকটিভ ইনি। এর কাছে অতি তীক্ষ্ণ বুদ্ধিমানও নাকি হার মেনে যায়।

আরে ছোঃ তাই বলে আমার কাছে এই চুনোপুঁটি কোনো চাল চালতে পারবে মনে করো। যাক, শোন–আমাদের যে মালমাল দস্যু বনহুর আটক করেছে তার সন্ধান আমরা পেয়েছি……

বলেন কি স্যার!

হাঁ।

কে এ সংবাদ এনেছে?

আমাদের দুজন সহচর কান্দাই জঙ্গলে কাঠুরিয়ার বেশে কাঠ কাটতে গিয়ে জেনে এসেছে।

তাহলে তো বড় সৌভাগ্যের কথা।

তা ঠিক কিন্তু মালামালগুলো উদ্ধার করা বড় কঠিন। কারণ দস্যু বনহুর স্বয়ং এ মালামাল রক্ষণাবেক্ষণ করছে।

হু বড় শক্ত ব্যাপার স্যার।

তবু উপায় একটা করতেই হবে। আমাদের পাঁচজন লোক অস্ত্রশস্ত্র নিয়ে সজ্জিত হয়ে বসে আছে কান্দাই পর্বতের বিভিন্ন স্থানে ঝোঁপ–ঝাড়ের মধ্যে। বনহুরকে তারা চেনে কাজেই অসুবিধা হবে না। তাকে হত্যা করতে পারলেই কাজ ফতে। অন্যদের হতাহত করতে বেগ পাবো না আমরা। যত ভয় দস্যু বনহুরকে……

হাঁ স্যার ঠিক বলেছেন। এতদিন দেশটা শান্তিপূর্ণ ছিলো। দস্যু বনহুরের কোনো উপদ্রব ছিলো না। আমরা সুন্দরভাবে ব্যবসা চালিয়ে চলেছিলাম। যা হোক তবু

তো মালামালের সন্ধান পাওয়া গেছে। স্যার, আমাদের প্রহরী আর ড্রাইভারদের খোঁজ পাওয়া যায়নি?

না, তবে তাদের সবাইকে বনহুর আটক করেছে তাতে কোনো সন্দেহ নেই। আমিও কমে ছাড়বো না, কৌশলে মালামাল উদ্ধার করবো, তারপর উদ্ধার করবো আটক বন্দীদের। বনহুরের আস্তানার খোঁজও পেয়েছি,

সত্যি বলছেন স্যার?

হাঁ, মনে রেখো হুয়াংহু কোনোদিন মিথ্যা বলে না। কাঠুরিয়ার বেশে আমাদের লোক গিয়ে আজ কদিন ধরে কান্দাই বনে বনে ঘুরছে যাক, সব কথা এখন না জানাই ভালো। দেখো ওর সংজ্ঞা ফিরে এলো কি না।

নূর ওদের সব কথা শুনলো এবং বুঝলো। তার মনে প্রচন্ড ঝড় উঠলো, বনহুরের আস্তানার

সন্ধান নাকি এরা পেয়েছে। সত্যি কি সন্ধান পেয়েছে এরা?

নূর একটু শব্দ করে পাশ ফেরার চেষ্টা করলো।

ওরা বেরিয়ে যাওয়ার জন্য ফিরে দাঁড়িয়েছে, এমন সময় নূর পাশ ফেরার চেষ্টা করতেই ওরা থমকে দাঁড়ালো।

হুয়াংহুর সহকারী বলে উঠলো–স্যার, মিঃ নূরের সংজ্ঞা ফিরে এসেছে বলে মনে হচ্ছে।

হাঁ তাই মনে হচ্ছে এসো দেখা যাক। হুয়াংহু আর তার সঙ্গী লোরী এসে দাঁড়ালো নূরের বিছানার পাশে।

নূরকে তুলে বসালো ওরা। ওপাশ থেকে কিছু এনে খেতে দিলো একটা গেলাসে করে।

তরল পদার্থ।

নূর দ্বিধা করছিলো।

বললো হুয়াংহু–এমন কোনো বস্তু নয় যা খেলে আপনার অসুবিধা হবে। পান করুন, নতুন জীবন লাভ করবেন।

নূর চোখ তুলে তাকালো হুয়াংহুর দিকে।

সে চোখে অন্তর্ভেদী দৃষ্টি।

বললো হুয়াংহু–যেমনভাবে মিঃ হুদাকে আপনি বন্দী করেছেন তেমনিভাবে আপনাকেও আমরা আটক করলাম। যদি কান্দাই পুলিশ তাঁকে মুক্তি দেয় তাহলে আপনি মুক্তি পাবেন নচেৎ নয়।

নূর কোনো জবাব দিলো না।

বললো হুয়াংহুর সঙ্গী–আপনার মুক্তি তখনই হবে যখন আপনি আমাদের মালিককে জেল থেকে বের করে আনায় সহায়তা করবেন।

এবার বললো নূর–কি রকম?......

রকম অতি স্বাভাবিক। আপনার অবস্থা নিয়ে কান্দাই শহরে তোলপাড় শুরু হয়েছে। এমন কি পুলিশমহলও খুব চিন্তিত হয়ে পড়েছে, হঠাৎ আপনার নিখোঁজ সবাইকে ভাবিয়ে তুলেছে। পথের মধ্যে আপনার গাড়িখানাকে অচল অবস্থায় পাওয়া গেছে, তাতে আরও বেশি উদ্বিগ্ন হয়ে পড়েছে সবাই, কারণ আপনাকে কেউ উধাও করেছে তা তারা অনুধাবন করেছে ভালভাবে। কথাগুলো বললো হুয়াংহুর সঙ্গী মিঃ লোরী।

নূর শুনতে লাগলো, ওরা যা বলছে তা সত্যি। তার নিখোঁজ সংবাদ ছড়িয়ে পড়ার সঙ্গে সঙ্গে শহরে ভীষণ একটা চাঞ্চল্যকর অবস্থার সৃষ্টি হয়েছে।

বললো নূর–আমাকে কি করতে হবে বলো?

আপনি এখন আমাদের বন্দী, যা বলবো তাই করবেন এটাই হলো নিয়ম।

যদি তোমাদের নিয়ম আমার মনপুত হয় তাহলে আমি করতে বা মানতে পারি না হলে নয়।

হুয়াংহুর চোখ দুটো এবার জ্বলে উঠলো, সে বললো–আমাদের যা নির্দেশ তা আপনাকে পালন করতেই হবে। নইলে আপনাকে নির্মম শাস্তি প্রদান করা হবে।

বল কি করতে হবে? বললো নূর।

হুয়াংই কক্ষের চারপাশে দেয়ালের দিকে আংগুল দিয়ে দেখিয়ে বললো–এই কক্ষের চারপাশে যে যন্ত্রপাতি এবং মেশিনাদি দেখছেন তা আপনার জন্যই এখন ব্যবহৃত হবে।

হুয়াংহুর কথা শেষ হয় না, নূরকে দাঁড় করিয়ে দেয় হুয়াংহুর সঙ্গী মিঃ লোরী। বলে সে নূরকে লক্ষ্য করে–চলুন ঐ চেয়ারটিতে বসুন।

নূর নীরবে নির্দেশ পালন করলো।

অদূরে মেঝেতে সংযুক্ত একটা চেয়ারে নূরকে বসিয়ে দেওয়া হলো। তারপর একটা সুইচে চাপ দিতেই তার সামনে একটা মাইক্রোফোন এগিয়ে এলো।

হুয়াংহু একপাশে অপর পাশে মিঃ লোরী।

বললো হুয়াংহু–আমি যখন মাইক্রোফোনটা চালু করে দেবো তখন লাল আলোটা জ্বলে উঠবে, আপনি তখন বলবেন....আমি নুরুজ্জামান বলছি। এখানে আমি কোথায় আছি জানি না। আমার ওপর কঠিন নির্যাতন চলছে। যদি আমার মঙ্গল আপনারা চান তাহলে মিঃ হুদাকে বিনা বিচারে মুক্তি দিতে হবে। তার মুক্তির ওপর নির্ভর করছে আমার জীবন–মরণ......বাস্, আর কিছু নয়।

নূর বললো–না, আমি একজন খুনীকে এভাবে মুক্তি দিতে বলতে পারি না।

হুয়াংহুর সঙ্গী দাঁতে দাঁত পিষে বললো–মৃত্যুগুহায় বসে এমন অহংকার দেখানো মোটেই যুক্তিসংগত নয়।

নূর বললো–মৃত্যুভয়ে আমি ভীত নই।

তাহলে আপনি মরতে চান?

সহজে কেউ মরতে চায় না, আমিও না। আমাকে হত্যা করে তোমাদের কোন লাভ হবেনা, কারণ বিচারে মিঃ হুদা রেহাই পাবেনা, তার মৃত্যুদন্ড হবেই, কারণ সে

মিঃ আহম্মদের হত্যাকারী প্রমাণিত হয়েছে।

যেমন করে হোক আমরা আপনাকে বাধ্য করবো যা বললাম সেই কথাগুলো ওয়্যারলেস মেশিনে বলতে। মিঃ হুদার মুক্তির সঙ্গে সঙ্গেই আমরা আপনাকে মুক্ত করে দেবো বলুন রাজি কথাটা বললো হুয়াংহু।

নূর এবারও বললো–যা বলছে তার একবর্ণও আমি বলবো না।

কি বললে, বলবেনা?

না! দৃঢ় কণ্ঠস্বর নূরের।

হুয়াংহু এবার সহকারীর দিকে ইংগিত করলো।

সহকারী মিঃ লোরী ওদিকের একটি ছোট্ট বাল্বসংযুক্ত তার এনে নূরের হাতের বাজুতে এঁটে ধরলো।

হুয়াংহু মাইক্রোফোনটা নূরের মুখের কাছে ধরে বললো–বলুন আমি যা বললাম একটু পূর্বে। বলুন, বলুন আমি ওয়্যারলেস মেশিনের মাইক্রোফোনের সুইচ অন করে দিলাম।

নূর বললো–না, বলবো না।

সত্যি বলবে না?

না।

এবার মিঃ লোরী নূরের হাতে সংলগ্ন তারের সুইচ টিপলো।

সঙ্গে সঙ্গে তীব্র আর্তনাদ করে উঠলো নূর।

লোরী সুইচ অফ করে বললো–কেমন এবার বলতে আপত্তি আছে।

নূর কোনো জবাব দিলো না, তার সমস্ত দেহ ঘেমে উঠেছে। বললোনা, আমাকে তোমরা যে কোনো শাস্তি দাও মেনে নেবো তবু আমি জঘন্য অন্যায় কাজ মেনে নেবে না।

ওঃ দেমাগ কমেনি। বললো হুয়াংহ। তারপর লোরীর দিকে তাকিয়ে বললো– চালাও আবার তোমার মেশিন।

লোরী আবার সুইচ টিপলে, সঙ্গে সঙ্গে যন্ত্রণায় আর্তনাদ করে উঠলো নূর।

বললো হুয়াংহু–সময় দাও ওকে ভাববার। তারপর আবার চালাবে।

হুয়াংহু আর লোরী দুজন মিলে নুরকে চেয়ার থেকে তুলে নিয়ে শয্যায় শুইয়ে দিলো। তারপর বললো হুয়াংহু–আবার একঘন্টা পর আসবোর ভেবে দেখুন শুধু মৃত্যু নয় কঠিন শাস্তি যা কোনোদিন অনুভব করেননি।

নূর দুচোখ বন্ধ করে পড়ে রইলো।

তার মনের পর্দায় তখন প্রতিফলিত হচ্ছে হুয়াংহুর সেই কথাগুলো–মিঃ হুদাকে মুক্তি দিতে হবে বিনা বিচারে, নইলে তাকে মৃত্যুবরণ করতে হবে। তারপর স্মরণ হলো হুয়াংহু আর অন্য লোরীর কথাগুলো–বনহুরের আস্তানার সন্ধান তারা পেয়েছে…কিন্তু কোনো উপায় নেই তার। সব শুনলেও কিছু করবার নেই কারণ সে এখন দুস্কৃতিকারীদের হাতের মুঠায়। কোথায় এখন রয়েছে তাও সে নিজে জানে না।

নূর যখন মিঃ হুদার সহকারীদের ষড়যন্ত্রের শিকার তখন তাকে নিয়ে কান্দাই শহরে ভীষণ একটা চাঞ্চল্যকর অবস্থার সৃষ্টি হয়েছে। সর্বত্র সন্ধান চলেছে নূরুজ্জামানের। হঠাৎ তাকে কারা উধাও করলো। বিশেষ করে তার গাড়িখানা যে অবস্থায় পাওয়া গেছে তাতে সবাই অনুমান করেছে। নুরুজ্জামান যখন ফিরছিলেন তখন কে বা কারা গুলী করে তার গাড়ির চাকা ফেসে দেয় এবং গাড়িখানা যখন আপনা আপনি থেমে পড়ে তখন তাকে আক্রমণ করা হয় এবং আটক করে কিন্তু কারা তারা?

এ প্রশ্ন সবার মনে।

পুলিশ মহল ভীষণ চিন্তিত হয়ে পড়েছেন।

মিঃ আহম্মদের হত্যাকান্ডের সঙ্গে জড়িত ব্যক্তিরাই যে মিঃ নূরকে উধাও করেছে তাতে কারও সন্দেহ রইলো না।

মিঃ হুদার বিচার চলছে।

মিঃ আহম্মদকে কিভাবে এবং কি কারণে হত্যা করা হয়েছে এ নিয়ে চলছে নানা ধরনের সাক্ষ্য দান। নূর ছিলো সবচেয়ে বড় সাক্ষী কারণ সে–ই প্রমাণ করেছিলো মিঃ আহম্মদের হত্যাকারী মিঃ হুদা এবং তাকে গ্রেপ্তারও করেছিলো নূরই।

সংবাদ শুনে মনিরা আহার–নিদ্রা ত্যাগ করে কান্নাকাটি শুরু করে দিলো। জানে না মনিরা সে জীবিত আছে না তাকে দুস্কৃতিকারীরা হত্যা করেছে।

মরিময় বেগমের অবস্থাও তাই।

তিনি বৃদ্ধা।

এত ভাবতে পারেন না তবু তিনি ভাবছেন, জায়নামাযে বসে দুহাত তুলে দোয়া করছেন, আমার নূরকে ভালভাবে ফিরিয়ে এনে দাও খোদা।

সরকার সাহেব আজকাল প্রায় অচল অবস্থায়। তবুও তিনি গাড়ি নিয়ে এখানে সেখানে খোঁজখবর নিচ্ছেন কোথায় গেলে নূরের সন্ধান পাবেন।

এক সময় হঠাৎ আরমানের কথা মনে পড়ে গেলো মনিরার। নূরের অন্তরঙ্গ বন্ধু আরমান। যদি সে এই বিপদ মুহূর্তে কোনো রকম সাহায্য করতে পারে,...... কথাটা ভেবে এক সময় মনিরা সরকার সাহেবকে নিয়ে আরমানের বাসায় রওনা দিলো।

মরিয়ম বেগম বললেন–বৌমা, আমাকেও নিয়ে চলো। নূরের জন্য আমার মন বড় অস্থির হয়ে পড়েছে। নূর নিশ্চয়ই ভাল অবস্থায় নেই, থাকলে আমার মন এমন উতলা হতো না।

কিন্তু মনিরা তাকে সঙ্গে না নিয়ে বললো–মামীমা, তুমি বুড়ো মানুষ শুধু শুধু হয়রান হতে যাবে কেন? বরং আমি আরমানকে ধরে নিয়ে আসবো। সে আমার ছেলের মত।

অবশ্য আরমানের কানেও কথাটা গিয়েছিলো। নূরের এই দুঃসংবাদে সেও মুষড়ে পড়েছিলো তবে তার বিশ্বাস ছিলো, নূর বুদ্ধিমান কাজেই বিপদকে সে

পরিহার করে মুক্ত হয়ে ফিরে আসবে। আরমান গভীরভাবে এ ব্যাপার নিয়ে চিন্তা করছে এমন সময় এলো সরকার সাহেব এবং মনিরা।

কেঁদে কেঁদে দুচোখ মনিরার লাল হয়ে উঠেছে। মুখে তার কোনো কথা বের হচ্ছে না। গাড়ি থেকে নেমে আরমানের সম্মুখে এসে তার বাকশক্তি যেন হারিয়ে ফেলল। কি বলবে সে ভেবে পাচ্ছে না।

সরকার সাহেব বললেন–বাবা, তুমি নিশ্চয়ই সব শুনেছো?

হা শুনেছি। বসুন আপনারা। শান্তকণ্ঠে বললো আরমান।

সরকার সাহেব মনিরাকে লক্ষ্য করে বললেন–বসো মা মনি। এখানে কেন এলে সব বলো?

বসলো মনিরা।

সরকার সাহেবও আসন গ্রহণ করলেন।

আরমান ওদিকের একটা চেয়ার টেনে এনে মনিরার মুখোমুখি বসলো, তারপর বললো–সব শুনেছি, আমি যা ভেবেছিলাম তাই হলো। সাবধানও করে দিয়েছিলাম ওকে।

মনিরা চোখ তুললো, বললো–তুমি ওকে সাবধান করে দিয়েছিলে?

হাঁ, আমি জানতাম মিঃ হুদার অনুচরগণ তাকে রেহাই দেবে না, কারণ মিঃ হুদা একজন জঘন্যতম অসৎ ব্যবসায়ী এবং তার দলবল অনেক। নূর মিঃ হুদাকে মিঃ আহম্মদের হত্যাকারী হিসেবে আবিষ্কার করে এবং তাকে গ্রেপ্তার করে সে নিজে, কাজেই..

মনিরা বাষ্পরুদ্ধ কণ্ঠে বললো–তুমি নূরকে সাবধান করে দেওয়া সত্ত্বেও সে রাতে বাইরে যেতো কেন?

ওর কর্তব্যকার্যে সময় নির্ধারিত ছিলো না। তাই সে বেরিয়ে গিয়েছিলো তবে এখানে সম্পূর্ণ একাকী যাওয়া তার ঠিক হয়নি।

আরমান, তুমি আমার ছেলে সমতুল্য। আমাকে তুমি বলে দাও এখন কি করবো? কেমন করে ফিরে পাবো আমার নূরকে?

অস্থির হবেন না, ধৈর্য ধরুন।

পারছি না আরমান, আমি পারছি না ধৈর্য ধরতে। তুমি আমার নূরকে এনে দাও। মনিরা দুহাতে মুখ ঢেকে কেঁদে ফেললো।

বললো আরমান–আমি এ ব্যাপারে গভীরভাবে চিন্তা করছি দেখি কি করতে পারি। আপনি বাসায় যান, বেশি উতলা হবেন না। বিপদে ধৈর্য ধরাই হলো প্রকৃত মানুষের কাজ।

তুমি যা বলছে বাবা তা ঠিক। কিন্তু আমার মন যে মানছে না। জানি না নূর কোথায়? কণ্ঠ বাষ্পরুদ্ধ হয়ে আসে মনিরার। একটু পরে বলে মনিরা–বাবা, তুমি আমার ভরসা। সত্যি তোমাকে, দেখলে আমার নূরের কথা মনে হয়।

আরমানের চোখ দুটো অশ্রুসজল হয়ে আসছিলো। কোনো কথা সে বললো না।

মনিরা পুনরায় বললো–জানি নূরের জন্য তুমিও ভাবছো কিন্তু কোথায় সে, কেমন করে সে ফিরে আসবে এ জন্য তোমাকে চেষ্টা করতে হবে আরমান।

এবার আরমান চোখ না তুলে পারলো না। বললো সে–কথা দিলাম আমি নূরের সন্ধানে আজই বেরিয়ে পড়বো। আপনি ভাববেন না, নূর যেখানেই থাক সে ফিরে আসবেই।

তোমার কথা যেন সত্য হয়। মনিরা বললো।

কোনো মসজিদ থেকে তখন ভেসে আসছে সুমধুর আজানের ধ্বনি।

*

মনিরা।

কে?

আমি!

তুমি?

হাঁ

কেন এলে?

এত বেশি উতলা হচ্ছে কেন মনিরা?

মনিরা স্বামীর বুকে মুখ লুকিয়ে ফুঁপিয়ে কেঁদে উঠলো–নিষ্ঠুর, তুমি বুঝবে না সন্তান হারানোর। কি ব্যথা!

বনহুরের চোখ দুটো সিক্ত হয়ে ওঠে। কম্পিত কণ্ঠে বলে মনিরা–তোমার যা খুশি বল। আমাকে তুমি তিরস্কার করো। তোমাদের তিরস্কার আমার ব্যথার খোরাক।

আমার নূরকে তুমি এনে দাও। যেমন করে পারা এনে দাও। আমি জানি তোমার অসাধ্য কিছু নেই। নূরকে এনে দাও, নইলে আমি আত্মহত্যা করবো।

মনিরা!

আমি আর কিছুই চাই না, তুমি নূরকে এনে দাও।

বনহুর মনিরার মাথায় ও পিঠে হাত বুলিয়ে দেয় কিন্তু কোনোরূপ সান্ত্বনা দিতে পারে না, কারণ সে নিজেও জানে না কোথায় আছে নূর।

মনিরা স্বামীর বুকে মাথা গুঁজে সান্ত্বনা খোঁজে।

তার মনে তখন নানা চিন্তার উদ্ভব হচ্ছিলো, নূর কোথায় আছে কেউ তারা জানে না। কেমন আছে সে তাও তারা জানে না। জীবিত আছে না তাকে হত্যা করা হয়েছে তাও জানে না কেউ। নূর যে তার নয়নের মণি হৃদয়ের ধন। যদি ওর কিছু হয়ে যায় তাহলে মনিরা বাঁচবে কি নিয়ে।

বনহুর অন্তর দিয়ে উপলব্ধি করে মনিরার হৃদয়ের ব্যথা। তার চোখ দুটোও শুষ্ক ছিলো না।

এমন সময় বাইরে গাড়ি থামার শব্দ হয়।

বনহুর বলে–মনিরা, আজ বিদায় দাও। তোমাকে কথা দিলাম নূরকে খুঁজে বের করবই।

বনহুর ততক্ষণে বেরিয়ে গেছে পাশের জানালা দিয়ে।

বাইরে শোনা গেলো সরকার সাহেবের গলা–বৌমা, দেখো কে এসেছে?

মনিরা বেরিয়ে এলো।

সরকার সাহেব বললেন–বৌমা, আরমান এসেছে।

হাঁ, আমি সেই রকম অনুমান করছিলাম। এসো বাবা এসোর মনিরা আরমান এবং সরকার সাহেবসহ প্রবেশ করলো কক্ষে।

আরমানকে বসতে বললো মনিরা।

বসলো আরমান। তার মুখমন্ডল গম্ভীর থমথমে।

বললো মনিরা–কোনো সন্ধান পেলে বাবা?

আরমান বললো–হাঁ, পেয়েছি।

বলো কি! আমার নূরের সন্ধান পেয়েছো?

তার কণ্ঠস্বর শোনা গেছে, অবশ্য আমি নিজে শুনিনি।

তোমার কথা ঠিক বুঝতে পারছি না আরমান। বললো মনিরা।

আরমান বললো–পুলিশমহলের ওয়্যারলেসে নূরের কণ্ঠস্বর ধরা পড়েছে।

আরমান।

হাঁ, ওয়্যারলেসের সাউন্ডবক্সে শোনা গেছে নূরের গলা। তাকে এমন কোনো দল উধাও করেছে যাদের মিঃ হুদার সঙ্গে যোগাযোগ আছে।

ওয়্যারলেসে কি বলেছে আমার নূর?

সে জানিয়েছে মিঃ হুদাকে তার জীবনের বিনিময়ে মুক্তি দিতে হবে বিনা বিচারে না হলে নূরকে তারা মুক্তি দেবে না।

এর বেশি কিছু বলেনি সে?

জানি না তবে আরও জানা যাবে। আপনাকে নিয়ে আমি পুলিশ অফিসে যাবো।

নিয়ে যাবে আমাকে সেখানে?

হা। চলুন আর বিলম্ব করা উচিত হবে না। হাতঘড়ির দিকে তাকায় আরমান। রাত নটা বাজে প্রায়।

মনিরা এবং সরকার সাহেবসহ আরমান নেমে আসে নিচে।

গাড়ি-বারান্দায় আরমানের গাড়ি অপেক্ষা করছিলো।

মনিরা গাড়ির পাশে এসে দাঁড়াতেই গাড়ির দরজা খুলে ধরে আরমান–উঠুন।

সরকার সাহেবকে ড্রাইভ আসনের পাশে বসিয়ে নিজে ড্রাইভ আসনে উঠে বসলো আরমান। গাড়ি বেগে ছুটতে শুরু করলো।

কান্দাইয়ের জনবহুল রাজপথ।

আরমান গাড়ি চালিয়ে চলেছে।

আরমান যখন গাড়ি চালিয়ে বেরিয়ে এলো চৌধুরীবাড়ি থেকে তখন আড়াল থেকে দুজন লোক তাকে লক্ষ করছিলো। তারা নিজেদের গাড়ি বেশ দূরে রেখে চৌধুরীবাড়ির বাগানে আত্মগোপন করে ছিলো।

আরমান যখন সরকার সাহেব এবং মনিরাসহ গাড়িতে উঠে বসলো তখন তারা নিজেদের মধ্যে কিছু বলাবলি করে নিলো।

গাড়ি বেরিয়ে যাবার সঙ্গে সঙ্গে তোক দুজন তাদের গাড়ির নিকট দৌড়ে গেলো এবং গাড়িতে চেপে বসলো।

আরমানের গাড়িকে ফলো করে চললো ওরা।

গাড়ি এসে যখন পুলিশ অফিসে প্রবেশ করলো তখন ঐ গাড়িখানা বেশ দূরে দাঁড়িয়ে পড়লো। লোক দুজন নেমে পড়ে ভালভাবে লক্ষ করতে লাগলো।

আরমান সরকার সাহেব ও মনিরাসহ পুলিশ অফিসে প্রবেশ করলো।

মিঃ হারুন এবং মিঃ আহসান বসে ছিলেন।

তারা আসন ত্যাগ করে সরকার সাহেব এবং মনিরাকে অভ্যর্থনা জানালেন। তারা জানতেন আরমান মিসেস মনিরাসহ আসছে। কাজেই তারা প্রস্তুত ছিলেন।

আরমান এবং তার সঙ্গীদ্বয় আসন গ্রহণ করলো।

মিঃ হারুন ও মিঃ আহসানকে লক্ষ্য করে বললেন সরকার সাহেব–আপনারা নূরের কোনো সন্ধান পেলেন?

বললেন মিঃ হারুন–পেয়েছি কিন্তু......

মনিরা ব্যাকুল কণ্ঠে বললো–বলুন কিন্তু কি?

নূরুজ্জামান দুস্কৃতিকারীদের হাতে বন্দী হয়েছে এবং তিনি কিছুটা অসুবিধার মধ্যে আছে বলে আমাদের ধারণা।

কি করে জানলেন আপনারা আমার নূর কষ্টের মধ্যে আছে। বললো মনিরা।

মিঃ হারুন অত্যন্ত বুদ্ধিমান ব্যক্তি, তিনি নূরুজ্জামানের অনেক কথাই জানেন, যা তিনি কোনো সময় ব্যক্ত করেন না কারও কাছে। অত্যন্ত চাপা লোক মিঃ হারুন। অবশ্য পুলিশ বিভাগে কাজ করতে হলে অনেক জ্ঞানসম্পন্ন হতে হয়। সাধারণ মানুষের ভিতর প্রবেশ করে উদ্ধার করতে হয় অনেক সমস্যার সমাধান। মিঃ হারুন সেরকমই। তিনি যতদূর পারেন কথা চেপে রেখে যতটুকু না বললে নয় তাই ব্যক্ত করলেন, বললেন–গতরাতে ওয়্যারলেসে হঠাৎ শোনা যায়

নুরুজ্জামানের গলা। সঙ্গে সঙ্গে ডিউটিরত পুলিশ অফিসার জানায় ইনচার্জ অফিসারকে। তিনি এসে শুনতে পান নূরুজ্জামানের কণ্ঠস্বর।

সরকার সাহেব বলে উঠলেন–যিনি এ সময় ছিলেন এবং নূরের কণ্ঠস্বর শুনেছেন তাঁকেই ডাকেন, আমরা তার মুখেই.......

তিনি এখন নেই। আমরা তার মুখে যা শুনেছি তা নোট করে নিয়েছি। নূরকে দুষ্কৃতিকারিগণ আটক রেখে মিঃ হুদার মুক্তি চাচ্ছে তবে তাকে সামান্য কষ্ট দিলেও হত্যা করবে না। আপনি নিশ্চিন্ত থাকুন। মিঃ হারুন মনিরাকে লক্ষ্য করে কথাগুলো বললেন।

আরমান বললো এবার–নূর কোথায় আছে কেমন আছে এসব কিছু জানায়নি?

না, তেমন কথা কিছু বলেনি। তবে মিঃ নূর জানালেন মিঃ হুদাকে বিনা বিচারে মুক্তি দিতে হবে, না দিলে তাকে শাস্তি দেয়া হবে।

অবশ্য মিঃ হারুন কিছুটা কথা চেপে গেলেন, কারণ মায়ের সম্মুখে সব কথা বলা ঠিক হবে না।

আরমান বুঝতে পারলো কিছু কথা মিঃ হারুন চেপে গেলেন। মনিরাকে বললো সে–নিজের কানে শুনলেন তো নূর বেঁচে আছে এবং ভালো আছে। মিঃ হুদার মুক্তির ওপর নির্ভর করছে নূরের মুক্তি। আপনি ভাববেন না, পুলিশমহল এবং বিচার কর্তাগণ ভাবছেন এ ব্যাপারে কি করা যায়।

মিঃ হারুন বললেন–হা, আরমান সাহেব যা বলছেন তা সত্য। আমরা নূরের কণ্ঠস্বর শোনার পর হতে চিন্তাভাবনা করছি। আপনি বাসায় ফিরে যান। যে কোনো সংবাদ হলে আপনাকে জানানো হবে।

আরমান বললো–চলুন এবার যাওয়া যাক। আপনি জেনে রাখুন আমি নূরের জন্য প্রাণ দিয়ে চেষ্টা করবো। যদি পুলিশমহল আমার দরকার মনে করেন তবে আমি সর্বান্তঃকরণে সহযোগিতা করবো।

সত্যি বাবা, তোমার কথাগুলো আমার মনে অনেকটা সান্ত্বনা এনে দিলো। আমার নূরকে তুমি ফিরিয়ে আনার চেষ্টা করবে বাবা।

নিশ্চয়ই করবো।

মিঃ হারুনও সান্ত্বনা দিলেন। এর বেশি আর কিইবা করবেন তারা।

আরমান সরকার সাহেব এবং মনিরাসহ ফিরে এলো চৌধুরী বাড়িতে।

এরপর থেকে আরমান চৌধুরীবাড়িতে ঘন ঘন আসা–যাওয়া শুরু করলো, কারণ মনিরার বিশ্বাস আরমান তার নূরের সন্ধান এনে দেবে।

*

বনহুর তাজের পিঠ থেকে নেমে দাঁড়াতেই একটি ছোরা চলে গেলো সাঁ করে তার পাশ কেটে। বনহুর চমকে উঠলো, তার আস্তানার সন্নিকটে তার শত্রু আত্মগোপন করে আছে বুঝতে পারলো সে।

তাজের পিঠে গোটা দুই চাপড় দিয়ে বনহুর তাকে কোনো সংকেত করলো, তারপর সে ছোরাখানার দিকে এগিয়ে গেলো।

তাজ শব্দ করলো চিহি চিহি করে।

সঙ্গে সঙ্গে বাঘা ছুটে এলো।

এতদিন বাঘা মনমরা হয়ে ছিলো। বনহুর ফিরে আসায় সে সজীব হয়ে উঠেছে।

তাজের সঙ্গে বাঘার খুব মিল।

যখন তাজ একা থাকে বাঘা থাকে তার পাশে। তাজ যখন ঘাস খায় তখন বাঘা বসে থাকে অদূরে।

যতক্ষণ তাজ বাইরে চলে যায় ততক্ষণ বাঘার ঘুমের সময়। বসে বসে ঝিমায় অথবা দুপায়ের মধ্যে মুখ রেখে চোখ বন্ধ করে ঘুমায়।

তাজের কণ্ঠ শুনতে পেয়েই ছুটে আসে বাঘা।

বাঘের মতই তার চেহারা। চোখ দুটো দিয়ে যেন আগুন ঠিকরে বের হয়। হিংস্র বাঘের থাবার মত তার থাবা। ধারালো দাঁত দুটো অন্যান্য কুকুরের চেয়ে লম্বায় বেশি। দেখলে ভয় হয়।

বাঘা ছুটে এলো তাজের পাশে।

লকলকে জিভ বেরিয়ে আছে। ভয়ংকর মূর্তি নিয়ে দাঁড়ালো সে। এই ছোরাখানা সমূলে বিদ্ধ হতো তার পিঠে, বুক ভেদ করে বেরিয়ে আসতো ছোরার ডগাখানা। বনহুর হাসলো, আপন মনে বললো, রাখে আল্লা মারে কে...বাঘার মাথায় হাত বুলিয়ে ছোরাখানার বাট বাঘার নাকের কাছে ধরলো, তারপর ইংগিত করলো যেদিক থেকে ছোরাখানা এসেছিলো সেইদিকে।

বাঘা ছোরার বাট শুঁকে নিয়ে তীরবেগে ছুটে গেলো সেইদিকে যেদিক থেকে ছোরাখানা এসেছিলো।

বনহুর তাজের পাশে দাঁড়িয়ে, কিন্তু তার দষ্টি ঐ দিকে যেদিকে বাঘা ছুটে গেছে।

বনহুর অল্পক্ষণের মধ্যে শুনতে পেলো তীব্র আর্তচিৎকার। তারপর ধস্তাধস্তির শব্দ।

ছোরা নিক্ষেপকারীকে আক্রমণ করেছে বাঘা তাতে কোনো ভুল নেই। বনহুর এবার দৌড়ে গেলো সেইদিকে। ছোরা নিক্ষেপকারী বেশ কিছু দূরে একটা ঝোঁপের মধ্যে আত্মগোপন করে ছিলো, বাঘা তাকে খুঁজে বের করে আক্রমণ করেছে।

বনহুর দেখলো একটা জোয়ান লোক ঝোঁপটার মধ্যে পড়ে আছে, তার বুকের ওপরে বসে আছে বাঘা।

বনহুর দেখলো লোকটা মরিয়া হয়ে উঠেছে। কপালে এবং গলায় নখ দিয়ে ক্ষত–সৃষ্টি করেছে। বাঘা। তাজা লাল রক্ত গড়িয়ে পড়ছে দরদর করে।

ডাকলো বনহুর–বাঘা চলে আয়।

বাঘা ঘাড় ফিরিয়ে বনহুরকে দেখলো, তারপর লোকটার বুকের ওপর থেকে নেমে দাঁড়ালো।

বনহুর এসে লোকটার ঘাড়ের কলার ধরে টেনে দাঁড় করিয়ে দিলো। দাঁতে দাঁত পিষে বললো–এ পথ তুমি কেমন করে চিনলে?

লোকটা বনহুরের মুখের দিকে তাকিয়ে ঢোক গিললো, কোনো জবাব দিলো না।

বনহুর ওর কলার ছেড়ে এবার বুকের জামার অংশ চেপে ধরলো, বললো–কে তোমাকে পথ চিনিয়ে নিয়ে এসেছে বলল, নইলে আবার তোমাকে কুকুরের মুখে নিক্ষেপ করবো।

তাকিয়ে দেখলো বনহুর, লোকটার চেহারা সভ্য মানুষের মত নয়। কোনো দুস্কৃতিকারী যে তাতে কোনো সন্দেহ নেই। ভয়ংকর তার শরীরের গঠন, দুঃসাহসী না হলে সে এখানে এ জঙ্গলে প্রবেশ করতো না। বনহুর বললো–জবাব দাও, নইলে তোমার শরীরের চামড়া খুলে নেবো।

লোকটা বললো–আমাকে কেউ পথ দেখিয়ে দেয়নি। আমি আরও তিনজনকে পথ দেখিয়ে নিয়ে এসেছি। আমি সত্যি কথা বলছি, আমাকে ছেড়ে দাও। তুমিই দস্যু বনহুর চিনতে আমার ভুল হয়নি।

হাঁ, তোমার লক্ষ্য ঠিক হলে তুমি জয়ী হতে কিন্তু তোমার দুর্ভাগ্য ছোরাখানা লক্ষ্যভ্রষ্ট হয়েছে। বনহুর কথাগুলো বলে প্যান্টের পকেট থেকে রিভলভার বের করে চেপে ধরলো লোকটার পাজরে।

লোকটা বললো–আমাকে হত্যা করো না, আমি সব বলছি।

বনহুর বুঝতে পারলো বাঘার থাবা তাকে ভীষণ ভড়কে দিয়েছে। ঘাবড়ে গেছে লোকটা। তারপর বনহুর তাকে বন্দী করে ফেললো, কাজেই ওর অবস্থা কাহিল।

এগিয়ে চললো লোকটা। যদিও তার কাছে অস্ত্র আছে তবু সে অস্ত্রে হাত নেবার সাহস পাচ্ছিলো না।

ঝোঁপটার বাইরে নিয়ে এসে বনহুর ওর অস্ত্র কেড়ে নিয়ে দূরে নিক্ষেপ করলো। তারপর বাঘার দিকে তাকিয়ে বললো–বাঘা, দেখ আর কে কোথায় লুকিয়ে আছে......যা খুঁজে বের কর।

বাঘা বুঝতে পারলো বনহুরের কথাগুলো। একবার বনহুরের চারপাশে ঘুরে দেখে নিলো, তারপর মাটি খুঁকে শুঁকে এগুতে লাগলো।

বনহুর লোকটাকে বললো–কি উদ্দেশ্যে এখানে এসেছো? শুধু আমাকে হত্যা করবার জন্য না অন্য কোনো অভিসন্ধি আছে তোমার মনে?

বললো লোকটা–সত্যি কথা বলতে কি আজ কদিন ধরে আমরা চারজন কান্দাই জঙ্গলে কাঠ কাটতে আসি......

হাঁ বলো। মনে রেখো একবর্ণ মিথ্যা কথা বললে মৃত্যু অনিবার্য। কোনো চালাকি করতে যেয়ো না।

লোকটা ঢোক গিলে বললো–আমি তোমার আস্তানার পথ আবিষ্কার করি এবং তোমাকে হত্যা করার চেষ্টা করি।

উদ্দেশ্য?

আমাদের মালিক মিঃ হুদার মালামাল তুমি আটক করেছে এবং রক্ষী ও ট্রাকের ড্রাইভারদের তুমি বন্দী করে রেখেছে।

হুঁ, সব খবর তাহলে রাখো?

মালিকের হুকুম, না রেখে উপায় কি?

তোমার সত্য কথার জন্য আমি তোমাকে ক্ষমা করবো যদিও তুমি আমাকে হত্যা করার চেষ্টা করেছিলে। অবশ্য আমার অনুচরগণ জানলে তোমাকে জীবিত থাকতে দেবে না।

বনহুর, তোমার নাম অনেক শুনেছিলাম কিন্তু তোমাকে স্বচক্ষে দেখবার সুযোগ পাইনি। যখন পেলাম হত্যার নেশা তখন আমাকে অন্ধ করে দিয়েছিলো। এখন তোমার মহত্ব আমাকে বিমুগ্ধ করলো, তোমাকে আমি হত্যা করতে এসে

অভিভূত হলাম, তুমি আমাকে এতক্ষণও হত্যা না করে জীবিত রেখেছে, তার জন্য আমি বিস্মিত হয়েছি।

তুমি আমার গুণাগুণের প্রশংসা করে আমাকে অন্যমনস্ক করতে পারবে না। শোন বন্ধু, তোমাকে আমি মুক্তি দিতে পারি এক শর্তে–তা হলো নূর কোথায় আছে তোমাকে বলতে হবে।

মিঃ নুরুজ্জামান

হাঁ

জানি না সে কোথায় তবে এটুকু জানি নুরুজ্জামান নিখোঁজ হয়েছে।

আবার মিথ্যে কথা?

না, মিথ্য কথা আমি বলছি না। মালিকের এ্যারেষ্ট হবার পর শুনেছি, মিঃ নূর নিখোঁজ হয়েছে। কিন্তু সে কোথায় জানি না……।

তার কথা শেষ হয় না, এমন সময় আর্তচিৎকার এবং বাঘার গর্জন।

বনহুর বুঝতে পারলো বনের মধ্যে আরও কোনো ব্যক্তি লুকিয়ে ছিলো। তারা আত্মগোপন করেও রক্ষা পায়নি। বাঘা তাদের খুঁজে বের করেছে। বনহুর প্যান্টের পকেট থেকে সিল্ক–কর্ড বের করে লোকটার হাত পিছমোড়া করে তাকে একটা গাছের গুঁড়ির সঙ্গে বেঁধে রাখলো মজবুত করে যেন সে পালাতে না পারে, তারপর দ্রুত ছুটে গেলো। কিছুটা এগুতেই দেখলো একটা লোক চীৎ হয়ে পড়ে আছে, কিন্তু তার দেহে প্রাণ নেই। গলার দুপাশে ক্ষত, রক্তে ভেসে যাচ্ছে তার পাশের মাটি।

বনহুর ধাক্কা দিয়ে কাৎ করলো লোকটাকে, কিন্তু কোনো সাড়া এলো না বা নড়াচড়া করলো না।

বুঝতে পারলো বনহুর লোকটাকে বাঘা খতম করে দিয়েছে। এবার বনহুর ঐ দিকে ছুটলো যেদিক থেকে আর্তনাদ আর গোঙ্গানির শব্দ ভেসে আসছে।

ঝোঁপঝাড় জঙ্গল অতিক্রম করে বেশ দূরে এসে পড়ে বনহুর। সে দেখলো বাঘা আরও একজনকে হত্যা করতে যাচ্ছে। বাঘা ভীষণভাবে কামড়ে ধরেছে লোকটার গলা।

ডাকলো বনহুর–বাঘা, বাঘা ছেড়ে দে...ছেড়ে দে......বাঘা ছেড়ে দেবার পূর্বেই লোকটার গোঙানি থেমে গেলো। বুঝতে বাকি রইলো না বনহুরের, লোকটা বাঘার আক্রমণ সহ্য করতে পারেনি। বাঘা দুটি লোককে হত্যা করে বসলো। বনহুর বাঘাকে ডাকতেই বাঘা এগিয়ে এলো বনহুরের পাশে। তবু মাঝে মাঝে বাঘা তাকাচ্ছিলো লোকটার দিকে।

বনহুর দেখলে বাঘার ভীষণ রাগ লোকটার ওপর। নিশ্চয়ই লোকটা তার ওপর কোনো আঘাত হেনেছিলো। বনহুরের চিন্তাধারা মিথ্যা নয়। লোকটার হাতে রয়েছে রাইফেল, খুব সম্ভব তার বাট দিয়ে বাঘার শরীরে আঘাত করেছিলো ওর কবল থেকে রক্ষা পাওয়ার জন্য।

বনহুর বাঘার মাথায় হাত বুলিয়ে তাকালো চারপাশে। প্রথম ব্যক্তি বলেছিলো তারা চারজন এসেছে এই জঙ্গলে কিন্তু তিনজন তার নজরে এলো। তবে আর একজন গেলো কোথায়?

তীক্ষ্ণদৃষ্টি মেলে বনহুর দেখতে লাগলো কিন্তু কোথাও কাউকে নজরে পড়লো না। নিশ্চয়ই একজন বাঘার কবল থেকে রক্ষা পাওয়ার জন্য কোনো গাছের ডালে আত্মগোপন করে আছে। অথবা চোচা দৌড় দিয়ে ভেগেছে।

বাঘাসহ বনহুর ফিরে এলো লোকটার পাশে।

লোকটা যন্ত্রণায় গোঙাচ্ছে।

বনহুর বললো–তোমার সঙ্গীদের খতম করেছে বাঘা। অবশ্য তার কোনো দোষ নেই, কারণ। আমার নির্দেশেই সে আক্রমণ করেছিলো।

ওরা নেই।

না।

তিনজনকেই তোমার বাঘা হত্যা করেছে?

তোমরা কজন ছিলে?

চারজন।

তিনজন তোমার আমার নজরে পড়েছে। দুজনকে বাঘা হত্যা করেছে আর তুমি আমার হাতের মুঠায় রয়েছে। আর একজন পালিয়ে প্রাণ বাঁচিয়েছে। কিন্তু জেনে রেখো, কান্দাই জঙ্গল থেকে পালিয়ে কেউ বাঁচতে পারবে না।

আমাকে মুক্তি দেবে না তুমি?

হাঃ হাঃ হাঃ…অট্টহাসিতে ফেটে পড়ে বনহুর। তারপর হাসি থামিয়ে বলে–মুক্তি পাবে তবে বিলম্বে, কারণ আমি জানি তোমরা হুদার লোক। হুদার মুক্তি ব্যাপারে তারা প্রখ্যাত তরুণ ডিটেকটিভ নুরুজ্জামানকে…….

কথা শেষ হয় না বনহুরের, দেখলো রহমান এবং অপর একজন অনুচর এদিকে এগিয়ে আসছে। তারা দ্রুতগতিতে আসছে বলে মনে হলো।

বনহুর এবং বাঘা তাকালো তাদের দিকে।

অল্পসময়ে এসে পড়লো তারা।

এক ব্যক্তিকে গাছের সঙ্গে বাঁধা অবস্থায় দেখতে পেয়ে এবং বাঘার শরীরে রক্তের ছাপ দেখে রহমান এবং অনুচরটা কিছুটা অনুমান করে নিলো।

রহমান বলে–সর্দার, কে এই ব্যক্তি।

বনহুর একটু হেসে বলে—-এর পরিচয় জানি না তবে যতটুকু জানি তাতে আমার বিশ্বাস এরা মিঃ হুদার লোক। অবশ্য এই লোকটি নিজেও সে কথা স্বীকার করেছে।

দুচোখে বিস্ময় নিয়ে বলে রহমান–এ এখানে কেন সর্দার?

শুধু এ একা নয়, আরও তিনজন এর সঙ্গী হিসেবে এসেছে। বাঘা দুজনকে খতম করেছে। আর একজন বন্দী তোমাদের সামনে। আর একজন নিশ্চয়ই পালিয়েছে।

এরা কেন এসেছিলো এখানে?

নিশ্চয়ই কোনো উদ্দেশ্য নিয়ে এসেছিলো এরা কিন্তু সফলকাম হতে পারেনি। বনহুর চেপে গেলো তাকে ওরা হত্যা করতে এসেছিলো কথাটা।

রহমানকে লক্ষ্য করে বললো বনহুর–ওকে নিয়ে চলো।

বনহুর তাজের পিঠে উঠে বসলো।

তাজ ছুটে চলেছে, পেছনে ছুটছে বাঘা।

রহমান ও অপর অনুচরটি বন্দীকে গাছের গুঁড়ি থেকে মুক্ত করে নিলো। তারপর হাত দুখানা পিছমোড়া করে বেঁধে নিয়ে চললো আস্তানার দিকে।

চোখ দুটো কালো কাপড়ে বেঁধে নিলো মজবুত করে।

লোকটা ভীষণ বিপদে পড়ে গেলো, সে ভাবতে পারেনি তার ভাগ্যে এমন এক অবস্থা ঘটবে। ভেবেছিলো বনহুরকে হত্যা করে সে বিরাট সুনাম ও অর্থের অধিকারী হবে।

*

একটা কুকুর তোমাদের দুজনকে হত্যা করলো আর তোমরা কুকুরটাকে ঘায়েল করতে পারলে না? মিঃ হুয়াংহু রাগত কণ্ঠে কথাগুলো বললো।

হুয়াংহুর সহকারী মিঃ লোরী গর্জন করে উঠলোকাপুরুষ তোমরা, তাই কোনো কাজ পারো না। একজন বন্দী হয়েছে দুজন কুকুরের কবলে প্রাণ হারিয়েছে আর তুমি পালিয়ে প্রাণ বাঁচিয়েছে। এবার সব কথা ফাস হবে তাতে কোনো সন্দেহ নেই।

হুয়াংহু বললো–এ কথা সত্যি দস্যু বনহুর যখন আমাদের পিছু লেগেছে তখন আর এগুনো সম্ভব হবে না।

স্যার, আপনি মিছামিছি ভড়কে যাচ্ছেন। কৌশলে কাজ করুন। বললো লোরী।

মিঃ হুয়াংহু বললো–সবাই যখন প্রাণ হারিয়েছে তখন একে জীবিত রেখে কোনো ফল হবে না। কথাটা বলেই তার হাতের সূতীক্ষ্ণ ধার ছোরাখানা সমুলে বসিয়ে দিলো হুয়াংহু লোকটার তলপেটে।

লোকটা তীব্র আর্তনাদ করে উঠলো, তারপর পড়ে গেলো মুখ থুবড়ে।

দেয়ালের ওপাশের কক্ষ থেকে সব শুনলো নূর। সে এবার বুঝতে পারলো কান্দাই জঙ্গল থেকে ওরা বিফল হয়ে ফিরে এসেছে। কুকুরের কবলে মৃত্যুবরণ করেছে দুজন। একজন আটক হয়েছে আর একজন পালিয়ে এসেছিলো কিন্তু এরা তাকে বাঁচতে দিলো না, হত্যা করলো। কারণ একটা তীব্র আর্তনাদ নূরের কানে প্রবেশ করলো। ঐ আর্তনাদ স্বাভাবিক যন্ত্রণার নয়, মৃত্যুকাতর আর্তনাদ।

নূর নিজেও কম যন্ত্রণা ভোগ করছে না। তাকে প্রতিদিন কারেন্ট যুক্ত চেয়ারে বসানো হয়, তারপর তাকে কারেন্ট সংযুক্ত করে ভয়ংকর শাস্তি দেয়া হয়।

মিঃ হুয়াংহু এক সপ্তাহ সময় দিয়েছে ঐ সময়ের মধ্যে যদি মিঃ হুদাকে আদালতে মুক্তি দেয় তাহলে নূর ছাড়া পাবে নচেৎ তাকে হত্যা করা হবে আগুনে দগ্ধীভূত করে।

কথাটা হুয়াংহু পুলিশমহলকে জানিয়ে দিলেও তারা এ কথা প্রচার করেননি। কাজেই কান্দাইবাসী সবাই এসব কথা জানে না।

আরমান পুলিশমহলের সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে যোগাযোগ রেখেছে বলে সে জানে সব কিছু এবং পুলিশমহলকে নুরের উদ্ধার ব্যাপারে সর্বান্তকরণে সে সহযোগিতা করবে বলে প্রতিশ্রুতি দিয়েছে।

নূরের অন্তরঙ্গ বন্ধু আরমান।

শত্রুপক্ষের কথাটা শুনে ভীষণ বিচলিত হয়েছে সে। নূরকে বাঁচাতে হলে মিঃ হুদাকে মুক্তি দিতেই হবে, এছাড়া নূরকে জীবিত অবস্থায় পাওয়া মুস্কিল।

আরমান সব সময় পুলিশ বিভাগের সঙ্গে এসব ব্যাপারে আলাপ–আলোচনা চালিয়ে চলেছে। নিজের জীবনের বিনিময়েও সে চায় নূরকে বাঁচাতে, কারণ নূরের মা মনিরার চোখের পানি সে সহ্য করতে পারে না, মনে পড়ে তার নিজের মায়ের মুখ। মা তাকে বড় আদর করতেন, একমাত্র সন্তান আরমান তাই সর্বক্ষণ

দৃষ্টির সামনে রাখতে চাইতেন কিন্তু শিক্ষালাভের জন্য তাকে যেতে হলো দেশের বাইরে তখন হারিয়েছে সে মাকে। ফিরে এসে আরমান মাকে দেখতে পায়নি। এ ব্যথা তার কোনোদিন যাবে না। মা ছিলেন তার একমাত্র আপন জন।

মনিরাকে দেখলে তার মায়ের কথা মনে হয়। শ্রদ্ধায় নত হয়ে আসে তার মাথাটা। এ কারণে আরমান নূরের সন্ধানে ঝুঁকে পড়ে অত্যন্ত মনোযোগ সহকারে।

একদিন আরমান জানতে পারলো নূরকে মিঃ হুদার সহকারিগণ ভূগর্ভে কোনো এক স্থানে আটক করে রেখেছে। তারপর চললো তার অবিরাম প্রচেষ্টা।

আরমান একদিন শহরের মধ্যে ঘুরে বেড়াচ্ছিলো, তার চোখ দুটোতে ছিলো তীক্ষ্ণ খুজছে সে নিজেই জানে, আর কেউ তার মনের খবর বুঝতে পারবে না। আরমানের শরীরে স্বাভাবিক পোশাক পরিচ্ছদ। চোখে চশমা।

একটা গাড়ি এসে থামলো তার পাশে।

চমকে উঠলো আরমান, গাড়ি থেকে নেমে এলেন এক ভদ্রলোক। চোখে তার কালো চশমা, মুখে চাপদাড়ি।

আরমানের কাঁধে হাত রেখে বললেন–এসো আমার গাড়িতে। সব জানতে পারবে।

অবাক কণ্ঠে বললো আরমান–আপনি কে?

বললাম তো সব জানতে পারবে।

কিন্তু আমি যাবো কেন আপনার সঙ্গে। আপনি কে?

আমি তোমাদের হিতাকাক্ষী। এসো, অবিশ্বাসের কোনো কারণ নেই।

ভ্রুকুঞ্চিত করে তাকালো আরমান।

হেসে বললেন ভদ্রলোক–বললাম তো অবিশ্বাসের কোনো কারণ নেই। আর তুমি যে ব্যাপারে ব্যাকুল আগ্রহ নিয়ে বেড়াচ্ছো, আমিও তাই সন্ধান করে ফিরছি।

আপনি কি করে জানলেন আমি কিসের সন্ধান করে ফিরছি?

আমি সব জানি। তোমাকে সাহায্য করবো।

আরমানের সন্দেহ আরও গম্ভীর হলো, কারণ এতক্ষণ যে কথাবার্তা লোকটা বললেন তাতে মনে হলো তিনি তার মনের কথা সব জানেন। সব বলে যাচ্ছেন, তবে কি তিনি সব জানেন……

কি ভাবছো আরমান?

আপনি আমার নাম জানলেন কি করে?

বললাম তো সব জানি। এসো আমার সঙ্গে। আমি তোমাকে যে পরামর্শ দেবো সেইভাবে কাজ করবে।

ভদ্রলোক আরমানকে আকৃষ্ট করে ফেলেছেন, সে অভিভূতের মত গাড়িতে উঠে বসলো।

দ্রলোক নিজেই গাড়ি চালিয়ে চলেছিলেন।

পাশে বসলো আরমান।

চোখে কালো চশমা, মুখে চাপদাড়ি। শুধু নাসিকার অগ্রভাগ আর তার প্রশস্ত ললাট দৃষ্টিগোচর হচ্ছিলো। আরমানের দৃষ্টি মাঝে মাঝে আটকে যাচ্ছিলো ভদ্রলোকের মুখে।

হাসছিলেন ভদ্রলোক।

যদিও তার দৃষ্টি ছিলো গাড়ির সম্মুখ ভাগে তবু আরমানের ভাবধারা ধরা পড়ছিলো তার কাছে।

গাড়িখানা সোজা পথ ধরে এগিয়ে যাচ্ছে। দুপাশে সেগুন আর মেহগনি গাছের সারি। থোকা থোকা মেহগনি ফুল ফুটে আছে গাছের ডগায়। কিছু কিছু ঝরে পড়েছে পথের ওপরে।

এ পথে কোনো সময় তীব্র রোদ তার প্রভাব বিস্তার করতে সক্ষম হয় না, কারণ সেগুন আর মেহগনি তাদের ছাতার মত মাথাটা দিয়ে সূর্যরশ্মির প্রবেশপথ রোধ করে থাকে। পথে যানবাহন চলাচল কালে চাকায় পিষ্ট হয়ে শুকনো পাতাগুলো ছড়িয়ে পড়ে এদিকে ওদিকে।

মাঝে মধ্যে লাইট পোষ্টগুলো মাথা উঁচু করে দাঁড়িয়ে আছে।

বেলা দুটো হবে।

গাড়িখানা এসে থামলো একটি পুরোন ধরনের বাড়ির সম্মুখে। মস্তবড় ফটক, পাশে সারিবদ্ধ পাইন গাছ। গেটের ওপাশেই মস্তবড় বাগান কিন্তু বাগানে ফুলগাছের তেমন সমারোহ নেই। পুরানো দুচারটে হাস্নাহেনার ঝড়। কোথাও বা মাধবি লতার ছাউনি। কেমন যেন সেকেলে ধরনের বাড়িটা।

আরমান ভালভাবে তাকালো বাড়িখানার দিকে। মুহূর্তে তার অবচেতন মনে প্রশ্ন জাগলো এভাবে আসা তার সমীচীন হয়নি। কে এই ভদ্রলোক? কিইবা এর অভিসন্ধি জানে না আরমান।

বাড়ির ভিতরটা লাল শুরকি বিছানো। পথের দুধারে ঝাম আর পাম গাছের সারি।

বাড়ির গাঁথুনি লাল ইটের এবং গোটা বাড়িখানা লাল রং করা তবে পুরোন সেকেলে ধরনের। গাড়ি-বারান্দায় গাড়ি থেমে পড়েছে।

ভদ্রলোক ড্রাইভ আসন থেকে নেমে পাশের দরজা খুলে ধরে বললেন– এসো......

আরমান নামলো।

কিন্তু তার চোখেমুখে সন্দিগ্ধ চাহনি।

এবার বললো আরমান–আমাকে আপনি কোথায় নিয়ে এলেন? কেন নিয়ে এলেন বলুন?

বললেন ভুদ্রলোক–সন্দেহ করবার কিছু নেই, পূর্বেই বলেছি আমি তোমার বন্ধু বা হিতাকাক্ষী।

আরমান কোনো জবাব না দিয়ে এগুতে থাকে। সামনে মস্তবড় হলঘর।

হলঘরে প্রবেশ করে আরমান অবাক হলো। চারদিকের দেয়ালে নানা ধরনের ঐতিহাসিক ছবি। বৈচিত্রময় আসবাবপত্র। সবকিছুতেই রয়েছে একটা আভিজাত্যের ছাপ। লাল গালিচা বিছানো মেঝেতে।

আরমান লক্ষ করলো এতক্ষণ একটি লোককেও সে দেখতে পায়নি এখানে।

ভদ্রলোক তার মুখোভাব লক্ষ করছিলেন।

হেসে বললেন–এটা আমার বাড়ি। এখানে আমি আর আমার এক পুরোন চাকর থাকে। এ ছাড়া আছে একটি কুকুর। তবে কুকুরটা দিনের বেলা আটক থাকে ভেতরের একটি কক্ষে। ভদ্রলোক কথা বলছেন আর এগুচ্ছেন।

আরমান তাকে অনুসরণ করছে।

কয়েকখানা কক্ষ পেরিয়ে একটি মাঝারি কক্ষে এসে দাঁড়ালেন ভদ্রলোক।

কক্ষটি বিশ্রামকক্ষ তাতে কোনো ভুল নেই।

কারণ আরমান দেখলে কক্ষের মাঝামাঝি একটি খাটের ওপরে বিছানা পাতা, পাশে টেবিল এবং একটা চেয়ার।

ভদ্রলোক বললেন আরমানকে লক্ষ্য করে–বসো।

আরমান বসলো চেয়ারে।

সে ভাবছে এসেছেই যখন তখন এর শেষ কোথায় জানা দরকার। আরমান আলগোছে। পকেটে রক্ষিত পিস্তলটা একবার স্পর্শ করে নিলো।

ভদ্রলোকের চোখে তা গোপন রইলো না। হাসলেন ভদ্রলোক। তারপর প্যান্টের পকেট থেকে সিগারেটকেসটা বের করে একটি সিগারেটে অগ্নিসংযোগ করেন। তারপর বলতে শুরু করেন–আরমান, তুমি তোমার বন্ধুকে খুঁজে বেড়াচ্ছো?

তোমার বন্ধুর জন্য তোমার ভীষণ উদ্বিগ্নতা রয়েছে। তার মায়ের কথা চিন্তা করে তুমি আরও বেশি উতলা হয়েছে।

আপনি এত কথা জানলেন কি করে?

আরও জানি এবং তোমাকে এ ব্যাপারে আমি সাহায্য করবো বলে কথা দিচ্ছি।

আমি খুশি হবো।

শোন আরমান, নূর এখন এমন এক স্থানে আটক আছে যেখানে অত্যন্ত যন্ত্রণার মধ্যে প্রতিটি মুহূর্ত কাটছে তার।

কোথায় কোন স্থানে আছে সে বলুন?

আমিও ঠিক জানি না তবে এটুকু জানি জেলে আটক হুদার কোনো গোপন গুদামকক্ষে সে আটক আছে এবং তাকে সেখানে যন্ত্রণা দেয়া হচ্ছে। যতদিন মিঃ হুদা মুক্তি না পাবে ততদিন তাকে এভাবে তারা শাস্তি দেবে।

আপনি অনেক কিছু জানেন দেখছি! বলুন কি ভাবে আমরা তাকে উদ্ধার করতে পারবো?

সে কথা বলার জন্যই তো তোমাকে নিয়ে এলাম।

তাহলে বলুন? জানেন, নূর শুধু আমার বন্ধুই নয় সে একজন দেশপ্রেমিক। তার জীবনে অনেক কিছু করণীয় আছে। একজন দেশপ্রেমিককে এভাবে শেষ হতে দেবো না আমরা।

আমিও তাই চাই! যদি নূরের মুক্তি চাও তবে মিঃ হুদাকে মুক্তি দিতে হবে।

আপনিও তাহলে ওদের লোক?

না। তোমার অনুমান মিথ্যা আরমান।

তবে একজন খুনী, শুধু খুনীই নয় একজন অসৎ কুচক্রীর মুক্তির জন্য আপনি....

হ্যাঁ, আমি কেন বলছি, অবশ্যই এর পেছনে কারণ আছে। বিশেষ করে নূরকে মুক্ত করাই হলো আমাদের মূল উদ্দেশ্য এবং সে জন্য, প্রথমে চাই মিঃ হুদার মুক্তি আর সে মুক্তির জন্য শুধু পুলিশমহল নয় বিচারপতিকে এ ব্যাপারে আয়ত্তে আনতে হবে এবং সেকারণেই আমি তোমাকে এখানে এনেছি..

তাহলে আমাকেও আপনি আটক করতে চান?

না, আমি তোমাকে কিছু পরামর্শ দেবো।

বলুন?

বিচারপতিকে ব্যাপারটা এমনভাবে বোঝাতে হবে তিনি যেন সব অনুধাবন করেন। ভদ্রলোক সিগারেটে একটা টান দিয়ে স্থিরভাবে শয্যার একপাশে হেলান দিয়ে বসলেন।

আরমানের চোখেমুখে বিস্ময় ফুটে উঠেছে। সে অবাক হয়ে তাকিয়ে আছে ভদ্রলোকের মুখের দিকে।

বললেন ভদ্রলোক–বিচারপতির নিকটে বলার দায়িত্ব আমি নিলাম আর তুমি পুলিশমহলকে বলবে তারা যেন প্রস্তুত থাকে।

ফোন পাবার সঙ্গে সঙ্গে পুলিশ ফোর্সসহ পুলিশ সুপার মিঃ হারুন যেন সেখানে উপস্থিত হন।

কোথায় উপস্থিত হবেন মিঃ হারুন পুলিশ ফোর্সসহ?

আমি সব তোমাকে বলছি।

বলুন, কিন্তু মনে রাখবেন যদি আপনার কোনো মন্দ অভিসন্ধি থাকে এবং আমাকে বিপদে ফেলেন, তাহলে আপনি রেহাই পাবেন না। কারণ আপনি জানেন নূরের অন্তর্ধান ব্যাপার নিয়ে কান্দাই পুলিশবাহিনী গোটা কান্দাই চষে ফিরছে।

একটু হাসলেন ভদ্রলোক। তারপর বললেন–তোমাকে বিপদে ফেলার ইচ্ছা থাকলে অনেক ভাবে তোমাকে বিপদে ফেলা যেতো কিন্তু আমি তোমাকে স্নেহ করি এবং সে জন্যই তোমার কাজে সহযোগিতা করবে বলে এগিয়ে এসেছি।

একটু থেমে পকেট থেকে একখানা ভাঁজ করা কাগজ আরমানের হাতে দিয়ে বললেন ভদ্রলোক–এর মধ্যে সব পাবে! আজ আর নয়, চলো তোমাকে পৌঁছে দিয়ে আসি।

কে আপনি বললেন না তো?

আমি কে তা জানার কোনো দরকার আছে বলে মনে করি না। তবে সময় এলে জানতে পারবে। এই ভাজ করা কাগজে সব লেখা আছে কিভাবে তুমি অগ্রসর হবে। তবে এখন নয় আমি যখন তোমাকে তোমার গন্তব্যস্থানে পৌঁছে দিয়ে বিদায় নেবো তখন তুমি ঐ ভাজকরা কাগজখানা খুলে দেখবে এবং ওটা নিয়ে পুলিশমহলের সঙ্গে আলাপ–আলোচনা করবে। তবে হাঁ, তুমি পুলিশমহলকে সব বলতে পারো, মানে আমার ব্যাপারে লুকোবার কিছু নেই।

আরমান ভাঁজ করা কাগজখানা হাতে নিয়ে এ পিঠ ও পিঠ উল্টে–পাল্টে দেখতে লাগলো কিন্তু সে খুলে ফেললো না, কারণ ভুদ্রলোক নিষেধ করেছেন ওটা এখন খোলা চলবে না।

আরমান ভদ্রলোকের সঙ্গে বেরিয়ে এলো।

গাড়ি-বারান্দায় গাড়ি দাঁড়িয়ে ছিলো, ভদ্রলোক ড্রাইভ আসনের পাশের দরজা খুলে ধরলো।

আরমান ভাঁজ করা কাগজখানা এতক্ষণ হাতের মুঠায় ধরে রেখে ছিলো, এবার সেটা পকেটে রেখে গাড়িতে উঠে বসলো।

দ্রলোক ড্রাইভ আসনে বসে গাড়িতে ষ্টার্ট দিলেন।

আরমান ভাবছে নানা কথা।

না জানি ঐ ভাজ করা কাগজে কি লেখা আছে? কি বলা হয়েছে ওটাতে।

ড্রাইভ আসনের পাশে বসে আরমান বারবার তাকিয়ে দেখে নিচ্ছিলো ভদ্রলোকের মুখখানা। দীপ্ত উজ্জ্বল দুটি চোখে অন্তর্ভেদী দৃষ্টি। প্রশস্ত ললাটে চিন্তারেখাগুলো স্পষ্ট বোঝা যায়। এক সময় গাড়ি দাঁড়িয়ে পড়ে।

গাড়ি থেকে নেমে দাঁড়ালো আরমান।

ভদ্রলোক ড্রাইভ আসন থেকে বললেন–আবার দেখা হবে।

গাড়ি চলে গেলো।

আরমান স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে তাকিয়ে রইলো গাড়ির দিকে। অনেক কথা তার মনে বিস্ময় সৃষ্টি করছিলো।

গাড়িখানা দৃষ্টির আড়ালে চলে গেলে আরমান পকেট থেকে বের করলো ভাজ করা কাগজখানা। মেলে ধরলো চোখের সামনে। মনোযোগ সহকারে পড়লো আরমান। এবার তার চোখের সামনে স্পষ্ট হয়ে এলো সবকিছু। কিন্তু কে এই ভদ্রলোক তার কোনো পরিচয় নেই এই কাগজে। আরমান কাগজখানা ভাজ করে পুনরায় পকেটে রাখলো তারপর একটা ট্যাক্সি ডেকে চেপে বসলো, ড্রাইভারকে বললো–পুলিশ অফিস।

আরমান জানে, এ সময় মিঃ হারুন পুলিশ অফিসে থাকবেন, কাজেই ভাঁজ করা কাগজখানা নিয়ে মিঃ হারুনের সঙ্গে আলাপ করা দরকার।

এতক্ষণে আরমানের মনে বিরাট একটা সান্ত্বনা উঁকি দিলো, নূর তাহলে কান্দাই শহরের মধ্যেই কোনো পোড়াবাড়ির অভ্যন্তরে ভূগর্ভে অবস্থান করছে। পথের নির্দেশও দেয়া আছে ভাঁজ করা কাগজখানায়।

আরমান গাড়িতে বসে আবার কাগজখানা মেলে ধরলো চোখের সামনে।

*

দরজা খোলার শব্দে মাথা তুলে তাকালো নূর।

কদিনে তার চোখ দুটো বসে গেছে। চুলগুলো এলোমেলো, চিরুনির ছোঁয়া পড়েনি কতদিন। যদিও তার ওপরে প্রতিদিন নির্যাতন চালানো হয় তবু তার মুখমন্ডলে বলিষ্ঠতার ছাপ বিদ্যমান। সাহসী বীর যুবক, নূর, ভড়কে যায়নি সে মোটেই।

নূর চোখ তুলতেই দেখতে পেলো মিঃ হুয়াংহু, মিঃ লোরী ও আরও দুজন তোক প্রবেশ করলো সেই কক্ষে।

বুঝতে পারলো আজ তার ওপর নতুন কোনো কঠিন শাস্তির ব্যবস্থা করা হবে। নূর মন ও দেহকে শক্ত করে নিলো। ভাগ্যে যা থাকে থাক তবু সে এদের কাছে নতি স্বীকার করবে না।

মিঃ হুয়াংহু এসে দাঁড়ালো নূরের পাশে।

আরও তিনজন যারা এসেছে তারা একটু দূরে দাঁড়িয়ে অপেক্ষা করছে। বললো মিঃ হুয়াংহু–দুসপ্তাহ অতিবাহিত হলো তবু আমাদের কথা পুলিশমহল মেনে নিলো না। আর আমরা অপেক্ষা করতে পারি না কারণ আমাদের বহু সময় এবং কাজ নষ্ট হচ্ছে।

নূর তাকালো মিঃ হুয়াংহুর মুখের দিকে। অগ্নিদীপ্ত তীক্ষ্ণ তার দৃষ্টি কোনো জবাব দিলো না

মিঃ লোরী কয়েক পা এগিয়ে এলো, সে কঠিন আর কর্কশ কণ্ঠে বললো–মিঃ হুদার বিচার চলছে। হয়তো তাঁর ফাঁসি অথবা যাবজ্জীবন কারাদন্ড হবে...... কিন্তু তার প্রতিশোধ আমরা নেবো তোমার ওপর। তোমাকে আর তারা পাবে না। তোমার জীবনের বিনিময়ে আমরা দাবি করেছিলাম মিঃ হুদার মুক্তি, কিন্তু পুলিশমহল কিছুতেই মেনে নিলো না আমাদের দাবি। আজ তাই......

মিঃ হুয়াংহু বললো–সব কথা ওর সম্মুখে না বলাই শ্রেয়, কারণ এখনও কিছু সময় আছে, এর মধ্যে পুলিশমহল তাদের ওয়্যারলেসে নতুন কোনো সংবাদ প্রেরণ করতেও পারে। ওয়্যারলেস মেশিনের সাউন্ড বক্স অন করে রাখো।

নূরের অনতিদূরেই ওয়্যারলেস মেশিনের সাউন্ড বক্স। লোরী নিজে সাউন্ডবক্সের সুইচ অন করে দিলো।

না, কোনো শব্দই শোনা যাচ্ছে না।

পুলিশ মহল নীরব।

তবে কি তারা নূরের জীবন রক্ষা চায় না?

নূর একবার সাউন্ডবক্সের দিকে তাকিয়ে দেখে নিলো। তার হাত দুখানা পিছমোড়া করে বাঁধা। শরীরের নানা স্থানে আঘাতের চিহ্ন। তার অপরাধ স্বনামধন্য ব্যক্তি মিঃ হুদাকে খুনী বলে আবিষ্কার এবং প্রমাণ করা ও তাকে আটক করা।

ন্যায় আর সত্যকে প্রতিষ্ঠিত করতে গিয়ে নূর যদি জীবন হারায় সেটা হবে তার গর্বের তবু সে এ নরাধমদের কাছে হার মানবে না।

কদিন অনবরত নির্যাতন চালানো হচ্ছে একাধারে নূরের ওপরে তবু সে পর্বতের মত অচল অটল।

প্রথম বার তাকে দিয়ে মিঃ হুদার মুক্তি সম্বন্ধে বলতে বাধ্য করলেও আর তার মুখ দিয়ে দ্বিতীয় বার ঐ শব্দ বের করা তাদের পক্ষে সম্ভব হয়নি। তাই নূরকে অনেক কঠিন শাস্তি পেতে হয়েছে। আজ আবার ওরা এসেছে তার ওপর নির্যাতন চালাতে।

মিঃ হুয়াংহু কলার ধরে ঝাঁকুনি দিয়ে টেনে তুলে দাঁড় করিয়ে দিলো নরকে, তারপর সঙ্গীদের লক্ষ্য করে বললো–আজ আর নয়! খতম করে দাও।

সঙ্গে সঙ্গে দুজন লোক এসে নূরকে দুপাশ থেকে এটে ধরলো তারপর টেনে নিয়ে চললো অপর এক কক্ষে। মিঃ হুয়াংহু এবং মিঃ লোরীও অপর কক্ষে এলো।

তাদের চোখেমুখে হিংস্র ভাব ফুটে উঠেছে।

লোক দুজন নূরকে নিয়ে একটা মেশিনের সম্মুখে এসে দাঁড়ালো। মেশিনের আকৃতি ভীষণ আর ভয়ংকর। মেশিনের দাঁতগুলো যেন তাকে গ্রাস করার জন্য হা করে আছে। নূর দুচোখ বন্ধ করে একবার ভেবে নিলো, মৃত্যু–মুহূর্তে স্মরণ করলো সে তার মায়ের মুখ। আর কোনোদিন সে তার স্নেহময়ী জননীকে দেখতে পাবে না। হারিয়ে যাবে সে সীমাহীন অন্ধকারে।

মিঃ হুয়াংহু বললো–এবার বুঝতে পারবে বাছাধন কর্মের প্রতিফল কেমন? তোমার দেহটাকে ঐ যাতাকলে পিষে ছাতু বানানো হবে। ইংগিত করলো মিঃ হুয়াংহু তার সঙ্গীদের দিকে–কাজ হাসিল করো।

লোক দুজন নূরকে হাত-পা বাঁধা অবস্থায় শূন্যে তুলে নিলো। এই বার তাকে যাঁতাকলের ভেতরে ফেলে নিষ্পেষিত করা হবে। থেতলে মাংসপিন্ডে পরিণত হবে নূরের দেহটা এবার।

মিঃ হুয়াংহু উচ্চারণ করলো–ওয়ান, টু, থ্রি......।

লোক দুজন নূরের দেহটা তুলে নিয়েছিলো হাতে এবার ছুঁড়ে দেবে সেই অদ্ভুত যাতাকলের মুখ গহ্বরে। ঠিক সেই মুহূর্তে একটা গুলী এসে বিদ্ধ হলো লোক দুজনের মধ্যে একজনের পিঠে।

লোকটা নূরের দেহখানা ছুঁড়ে দেবার পূর্ব মুহূর্তেই হুমড়ি খেয়ে পড়ে গেলো মুখ থুবড়ে।

নূরও পড়ে গেলো মেঝেতে।

যাতাকল তখন অদ্ভুত শব্দে বন বন করে চক্রাকারে ঘুরতে শুরু করেছে।

মিঃ হুয়াংহু ফিরে তাকালো পেছন দিকে।

সঙ্গে সঙ্গে লোরীও ঘুরে দাঁড়ালো।

তারা বিস্ময়ভরা চোখে দেখলো জমকালো পোশাক পরা এক ব্যক্তি দাঁড়িয়ে আছে দরজার মুখে। হাতে তার রিভলভার।

মিঃ হুয়াংহু এবং মিঃ লোরীর মুখমন্ডল মুহূর্তে ফ্যাকাশে হয়ে উঠলো। তারা ভাবতেও পারেনি এই গোপন স্থানে অন্য কেউ প্রবেশ করতে পারে। কি করে এখানে এলো এই বিস্ময়কর ব্যক্তিটা।

কিন্তু ভাবার সময় নেই, হুয়াংহু পকেট থেকে পিস্তল বের করতে গেলো।

জমকালো মূর্তি দ্রুত এগিয়ে এসে তার বুকে রিভলভার চেপে ধরে বললো–খবরদার পকেটে হাত দিও না।

লোরীও পারলো না অস্ত্রে হাত স্পর্শ করতে।

সেও কিংকর্তব্যবিমূঢ় হয়ে দাঁড়িয়ে রইলো।

নূরের হাত-পা বাঁধা অবস্থায় থাকায় সে চট করে উঠে দাঁড়াতে পারছিলো না। চিনতে তার বাকি রইলোনা কে এই জমকালো পোশাকপরা ব্যক্তি। আশায় আনন্দে চোখ দুটো তার দীপ্ত হয়ে উঠলো। কিন্তু সে কোনো রকম শব্দ উচ্চারণ করলো না। তার মনে নানা প্রশ্ন উঁকি দিলো। নূর ভাবতেও পারেনি তার সন্ধান পাবে তার আব্বু। কেমন করেই বা তার সন্ধান পেলো? আর পথই বা চিনলোকি করে? যে স্থানে তাকে রাখা হয়েছে এ স্থান অত্যন্ত গোপনীয়। যে জায়গার খোঁজ কেউ সহসা পাবে না।

নূর প্রাণভরে খোদাতালার কাছে শুকরিয়া জানালো। ঠিক, ঐ সময় যদি তার আব্বুর আবির্ভাব না ঘটতো তাহলে সে কিছুতেই প্রাণে রক্ষা পেতো না। এতক্ষণ তার দেহটা ঐ যাতাকলে পিষে যেতে।

জমকালো মূর্তির মুখমন্ডল সম্পূর্ণ দেখা না গেলেও দুটো চোখ আর প্রশস্ত ললাট নূরকে পরিচয় জানিয়ে দিলো কে সে। আনন্দে নূর ভুলে গেলো এতদিনের তার নির্মম যন্ত্রণার কথা।

তার আব্বু বনহুর এবং তার অসাধ্য কিছুই নেই তা জানে নূর। তবুও ভাবতে পারেনি সে বনহুর ঠিক ঐ সময় এসে তাকে উদ্ধার করবে সদ্যমৃত্যু হতে।

বনহুরের কোনোদিকে খেয়াল নেই। সে মিঃ হুয়াংই, মিঃ লোরী এবং তাদের জীবিত অনুচরটির দিকে রিভলভার উদ্যত রেখে কঠিনভাবে বললো–একচুল এদিক ওদিক নড়বে না। নড়লেই ঐ অবস্থা হবে...মেঝেতে পড়া প্রাণহীন রক্তাক্ত দেহটার দিকে আংগুল দিয়ে দেখিয়ে দিলো সে। যদিও বনহুর আংগুল দিয়ে নিহত লোকটির দেহ দেখিয়ে কথাটা বললো কিন্তু তার দৃষ্টি এবং লক্ষ্য ছিলো মিঃ হুয়াংই ও তার সঙ্গীদ্বয়ের দিকে। কাজেই তারা এক পা–ও এদিক ওদিক সরতে বা নড়তে পারলো না।

বনহুর এবার ওপরের দিকে লক্ষ্য করে একটি গুলী ছুড়লো।

সঙ্গে সঙ্গে সেখানে প্রবেশ করলেন মিঃ হারুন এবং আরও কয়েকজন সশস্ত্র পুলিশ। কিন্তু তারা কক্ষে প্রবেশের পূর্ব মুহূর্তেই বনহুর অন্তর্ধান হয়েছে। বনহুর এমন এক জায়গায় দাঁড়িয়ে ছিলো যেখানে ছিলো একটি গোপনপথ।

চট করে চোখে পড়বে না, তবে মেঝেতে একটা সুইচ ছিলো তাতে চাপ দিলেই মেঝেটা নেমে যাবে নিচে এবং সে জায়গায় পুনরায় নতুন মেঝে সরে এসে স্থানটিকে মুহূর্তে পূর্বের ন্যায় করে দেবে।

হুয়াংহু ও তার অনুচরগণ ঐ জায়গায় এসে দাঁড়াবার জন্য আপ্রাণ চেষ্টা করেছিলো কিন্তু বনহুর সে জায়গার কথা হুদার অনুচরের কাছে জেনে চিনে নিয়েছিলো এবং পুলিশ ফোর্স এসে পড়ার সঙ্গে সঙ্গে অন্তর্ধান হবে বলেই সে প্রস্তুত ছিলো।

পুলিশ ফোর্স এবং মিঃ হারুনের সঙ্গে ছিলো আরমান। ভাজ করা সেই কাগজখানাতে সব খোলসা লেখা ছিলো এবং একটা রেখাচিত্র ছিলো, যা পুলিশবাহিনীকে পথ প্রদর্শন করে এই অজ্ঞাত স্থানে নিয়ে এসেছে। ভাঁজ করা কাগজখানায় আরও ছিলো, গুলীর শব্দ না শোনা পর্যন্ত পুলিস ফোর্স যেন কক্ষে প্রবেশ না করে।

গুলীর শব্দের প্রতীক্ষায় ছিলো পুলিশ ফোর্স এবং মিঃ হারুন।

আরমানসহ মিঃ হারুন যখন অস্ত্র উদ্যত করে কক্ষে প্রবেশ করলেন তখন হুয়াংহু ও লোরী পাথরের মূর্তির মত স্তব্ধ হতবাক হয়ে গেছে? তারা স্বপ্ন দেখছে না সত্য ভাবতে পারে না।

মিঃ হারুন এবং পুলিশবাহিনীর সবার হাতেই ছিলো গুলীভরা রিভলভার এবং রাইফেল। এমন কি আরমানের হাতেও ছিলো একটি রিভলভার।

সবাই নিজ অস্ত্র উদ্যত করে প্রবেশ করেছিলো বিদ্যুৎ গতিতে, কাজেই মিঃ হুয়াংহু এবং মিঃ লোরী অস্ত্র হাতে নেবার সুযোগ করে উঠতে পারেনি।

মিঃ হারুন পুলিশদের লক্ষ্য করে বললেন–হুঁয়াংহু ও তার অনুচরদ্বয়কে গ্রেপ্তার করে ফেলো এবং সমস্ত ভূগর্ভ গোপন মালখানাসহ সব ঘেরাও করে ফেল।

দুজন পুলিশ অফিসার মিঃ হুদার প্রধান সহচর–মিঃ হুয়াং এবং মিঃ লোরীর হাতে হাতকড়া পরিয়ে দিলো।

অপর একজন পুলিশ হাতকড়া পরিয়ে দিলো অন্য অনুচরটির হাতে।

মিঃ হারুন নূরকে মেঝেতে পড়ে থাকতে দেখে তাড়াতাড়ি নিজে তুলে বসিয়ে দিলেন। তার হাত ও পায়ের বাধন খুলে দিলেন। মিঃ হারুন এবং অফিসারগণ মিঃ হুয়াংহুর পরিচিত। আজ হুয়াংহু তাদের সামনে মাথা নত করে দাঁড়িয়ে রইলো, একটি কথাও উচ্চারণ করতে পারলো না তারা।

মিঃ হারুন নূরের হাত-পা মুক্ত করে তাকে তুলে দাঁড় করিয়ে দিয়ে বললেন–বহু সন্ধান করেও তোমার খোঁজ পাইনি। এই আরমান সাহেব আমাদের যদি সহায়তা না করতো তাহলে আমরা তোমাকে উদ্ধারে সক্ষম হতাম না এ কথা সত্য।

নূর এতক্ষণ আরমানের দিকে তেমনভাবে লক্ষ্য করেনি। এবার নূর আরমানকে জড়িয়ে ধরলো।

আরমান অশ্রুসিক্ত নয়নে বাষ্পরুদ্ধ কণ্ঠে বললো–কেমন আছো নূর?

নূর বললো–এক সেকেন্ড দেরী হলে আমার মৃত্যু ঘটতো। ঐ যে যাঁতাকল বন বন করে ঘুরছে ওর মধ্যে আমাকে ওরা হাত-পা বেঁধে নিক্ষেপ করতে যাচ্ছিলো……

উঃ! কি যে পরিণাম হতো সত্যি ভাবতেও পারছি না নূর। কিন্তু সেই ভদ্রলোক কোথায় যিনি গুলীর আওয়াজ করেছিলেন?

নূর বললো–তিনি চলে গেছেন।

চলে গেছেন?

হাঁ

আশ্চর্য লোক তিনি। যে ভাঁজ করা কাগজখানা তিনি আমাকে দিয়েছিলেন সেই নির্দেশ অনুসারে আমি কাজ করেছি এবং মিঃ হারুন আমাকে সেভাবে তার পুলিশবাহিনী নিয়ে সাহায্য করেছেন নাহলে তোমাকে উদ্ধার করা সত্যিই দুস্কর হতো। ভদ্রলোকের মুখে চাপদাড়ি, চোখে কালো চশমা, বড় মিষ্টি তার কণ্ঠস্বর, কিন্তু কোথায় গেলেন তিনি?

জানি না। নর আনমনা হয়ে পড়লো।

মিঃ হারুন কিছুটা আঁচ করেছেন, তিনি প্রসঙ্গটিকে চাপা দিয়ে বললেন–মিঃ আরমান, আপনি নুরুজ্জামানকে নিয়ে চলে যান। বাইরে পুলিশ ভ্যানসহ একটি পুলিশবাহিনী অপেক্ষা করছে, তারা আপনাদের পৌঁছে দেবে। আর আমরা পুলিশ ফোর্স সহ এই ভূগর্ভ আস্তানায় তল্লাশি চালাবো। একটু থেমে বললেন তিনি–মিঃ হুয়াং আপনি সব দেখাবেন যেন একটিও বাদ না যায়।

মিঃ হুয়াংই অন্যদিকে মুখ ফিরিয়ে দাঁড়িয়ে রইলো।

এতবড় পরাজয় তার জীবনে এই প্রথম।

মিঃ হারুন বললেন–আর বিলম্ব করা উচিত হবে না মিঃ আরমান, আপনি আপনার বন্ধুসহ চলে যান। ওর সেবাযত্ন এবং চিকিৎসার প্রয়োজন।

আরমান বললো–স্যার, আমি নূরকে নিয়ে যাচ্ছি।

*

সত্যি নূর, তোমাকে উদ্ধার করা সম্ভব হবে তা যেন কল্পনার বাইরে ছিলো। কারণ পুলিশমহল দিবারাত্র তোমার সন্ধান চালিয়ে সম্পূর্ণ ব্যর্থ হয়ে ছিলো। এমনকি মিঃ হারুন সম্পূর্ণ ব্যর্থ হয়ে ছিলো। এমনকি মিঃ হারুন পর্যন্ত নার্ভাস হয়ে পড়েছিলেন। মিঃ শংকর রাও তিনি এতবড় দক্ষ গোয়েন্দা হয়েও কিছু করতে পারলেন না। কথাগুলো বলে আরমান চেয়ারে হেলান দিয়ে বসলো।

মনিরা বললো–তোমাকে কি বলে যে ধন্যবাদ জানাবো বাবা ভেবে পাচ্ছি না। ভাগ্যিস তোমার কাছে গিয়ে সংবাদটা জানিয়েছিলাম।

আপনি না গেলেও আমি নূরের অন্তর্ধানের কথা শোনার পর বড় অস্থির হয়ে পড়েছিলাম। তবে আমি কিছু করিনি। নূরের উদ্ধার ব্যাপারে যদি সেই ভদ্রলোক আমাকে সাহায্য না করতেন তাহলে হয়ত আজ আমরা যে আনন্দ লাভ করছি তা কোনোদিন সম্ভব হতো না। আমরা হারাতাম নুরকে......কাজেই আপনি আমাকে ধন্যবাদ জানিয়ে লজ্জা দেবেন না।

সত্যি বাবা, তোমার কাছে সব শুনে অবাক হয়েছি কে তিনি, যিনি তোমাকে এ ব্যাপারে সহায়তা করেছিলেন এবং তার সাহায্য না পেলে হয়তো আমি নূরকে হারাতাম।

ঐ একই প্রশ্ন আমার মনেও–কে তিনি? যদি তাকে আর একবার দেখতে পেতাম তাহলে হয়তো তার পরিচয় জেনে নেওয়া সম্ভব হতো।

নূর চুপ চাপ শুয়ে শুনে যাচ্ছিলো ওদের কথাবার্তা। সে বুঝতে পেরেছে কে সেই ভদ্রলোক। খুশিতে নূরের চোখ দুটো বন্ধ হয়ে আসে।

মনিরা নূরের চুলে হাত বুলিয়ে বলে–নূর, এখন কেমন লাগছে?

নূর চোখ মুদেই বলে–আম্মু, মিছামিছি তোমরা বেশি উতলা হচ্ছে। আমি ঠিক আছি.....

*

বনহুরের জামার বোতাম খুলে দিতে দিতে বললো নূরী–সত্যি তোমার অসাধ্য কিছু নেই। তুমি জয়ী হবে তা আমি জানতাম।

বনহুর শয্যায় গা এলিয়ে দিয়ে বললো–আর এক মুহূর্ত বিলম্ব হলে নূরকে বাঁচানো সম্ভব হতো না।

কুচক্রী দল গ্রেপ্তার হয়েছে?

হাঁ, মিঃ হারুন দক্ষতার সঙ্গে কাজ করেছে। শুধু হুয়াংহু আর লোরীই এ্যারেষ্ট হয়নি, তাদের গোপন আড্ডাখানায় যারা ছিলো সবাই এ্যারেষ্ট হয়েছে। আর সবচেয়ে বেশি খুশি হয়েছি মিঃ হুদার সমস্ত মালখানা কান্দাই সরকারের দখলে চলে এসেছে...

সত্যি বলছো হুর?

অত্যন্ত সূকৌশলে কাজ সমাধা হয়েছে। নূর অতি বুদ্ধিমত্তার সঙ্গে মিঃ আহম্মদ হত্যার মূল রহস্য উদঘাটন করতে সক্ষম হয়েছে। মিঃ হুদা নিজে হত্যাকারী প্রমাণিত হয়েছে। একটু থেমে বললো বনহুর–হুঁয়াংহু নূরকে প্রতিহিংসায় আটক করেছিলো এবং নূরের বিনিময়ে মুক্ত করতে চেয়েছিলো তার মনিবকে। কিন্তু সে আশা তার সমূলে বিনাশ হয়েছে।

নূর এখন কোথায়? বললো নূরী।

বনহুর একটা স্বস্তির নিশ্বাস ত্যাগ করে বললো–এখন সে মায়ের কাছে।

সত্যি বড় খুশি আর দুশ্চিন্তামুক্ত হয়েছে বোন মনিরা।

হাঁ নূরী, মনিরা সন্তানকে ফিরে পেয়ে খুব খুশি হয়েছে। যেমন তুমি জাভেদকে পেয়ে আনন্দমুখর হয়ে উঠেছে।

মিথ্যা নয় হুর, তুমি যা বলেছে তা সত্য। মায়ের কাছে সন্তান যে কত আদরের ধন তা তুমি বুঝবে না। কথাটা বলে একটা দীর্ঘশ্বাস ত্যাগ করলো নূরী।

জাভেদ কোথায়? হঠাৎ প্রশ্ন করে বসলো বনহুর।

ও সব সময় উদভ্রান্তের মত ঘুরে বেড়ায়। হুর, ওকে আমরা আর কোনোদিন সুস্থ করতে পারবো না?

জানি না নূরী, ও আর কোনোদিন স্বাভাবিক জ্ঞান ফিরে পাবে কিনা। গভীর একটা চিন্তার ছাপ ফুটে উঠলো বনহুরের মুখমন্ডলে।

নূরী বললো–সর্বক্ষণ ওকে চোখে চোখে রাখা বড় অসুবিধাজনক হয়ে পড়েছে। মাহবুব সব সময় জাভেদকে লক্ষ্য করে চলেছে, তবুও ভয় হয় কখন কোন্ ফাঁকে পালিয়ে যাবে সে জানে?

নূরী।

বলো?

তোমাকে বলেছিলাম না হুমায়রার কথা?

হাঁ বলেছিলে।

জাভেদ তারই ওখানে থাকাকালীন সন্ন্যাসীর ওষুধের গুণে স্মৃতিশক্তি হারিয়ে ফেলেছে। স্মৃতিশক্তি হারানোর পর সে হুমায়রার সান্নিধ্যেই ছিলো। আমার মনে হয় জাভেদ হুমায়রাকে চিনতে পারবে এবং তাকে সুস্থ করে তোলার ব্যাপারে হুমায়রার সাহায্য আমাদের দরকার আছে।

কিন্তু ফুল্লরা, সে কিছুতেই হুমায়রাকে..

এটা তেমন কিছু নয়।

তুমি বুঝবে না। ফুল্লরা জাভেদকে প্রাণ অপেক্ষা ভালবাসে, কাজেই হুমায়রাকে যদি এখানে নিয়ে আসো তাহলে সে কিছুতেই হুমায়রাকে জাভেদের পাশে যেতে দেবে না।

হাঃ হাঃ করে হেসে উঠলো বনহুর–জাভেদের পাশে হুমায়রা গেলেই সে জাভেদকে দখল করে নিলো?

বললাম তো তুমি বুঝবে না নারীজাতির অন্তরের কথা। তারা যাকে ভালবাসে তার জন্য সবকিছু ত্যাগ করতে পারে কিন্তু যাকে ভালবাসে তাকে কারও হাতে তুলে দিতে পারে না।

নুরী, নারীজাতি বড় অবুঝ সরল সহজ তাই তাদের মন এত দুর্বল.....একটুতেই তারা......

চুপ করো, চুপ করো তুমি নারীজাতিকে দুর্বল বলবে না বরং বলতে পারো তারা অনেক ধৈর্যশীল।

অবশ্য সে কথা মিথ্যা নয়, পুরুষের চেয়ে নারীজাতি অনেক ধৈর্যশীল তার প্রমাণ আমি অনেক পেয়েছি আর সে জন্য আমার এত শ্রদ্ধা নারীজাতির ওপর। যাক এবার বললো কিভাবে জাভেদের সংজ্ঞা ফিরিয়ে আনা সম্ভব হবে? আমার মনে হয় জাভেদ হুমায়রাকে চিনতে পারবে এবং তার সহায়তায় জাভেদ স্বাভাবিক সংজ্ঞা লাভও করতে পারে।

তাহলে তুমি জাভেদকে আশার ওখানে নিয়ে যাও এবং হুমায়রার সঙ্গে তার দেখা করাও, যদি বাছার আমার কোনো পরিবর্তন আসে। কথাগুলো নূরী ব্যথাকরুণ কণ্ঠে বললো।

বনহুর একটা দীর্ঘশ্বাস ত্যাগ করে সোজা হয়ে বসে বললো–জানিনা হুমায়রা এতদিন আশার। ওখানে আছে না চলে গেছে।

এমন সময় কায়েস কক্ষের বাইরে শব্দ করে বললো–সর্দার, আসতে পারি?

বনহুর বললো–এসো।

কায়েস হন্তদন্ত হয়ে কক্ষে প্রবেশ করে কুর্ণিশ জানিয়ে বললো–দুঃসংবাদ সর্দার।

দুঃসংবাদ।

হা সর্দার।

কি ঘটেছে?

মিঃ হুদার যে মালামালগুলো আমাদের আস্তানায় রক্ষিত ছিলো সে মালামাল কাল রাতে আপনার নির্দেশমত আমরা সিন্দার বস্তি এলাকায় বিলিয়ে দিয়ে ফিরে আসবার সময় একটা অদ্ভুত জীব আমাদের ওপর হামলা চালায় এবং একজনকে নিয়ে যায়।

বল কি। কেমন সে জীব আর কাকেই বা নিয়ে গেছে। বিস্ময় নিয়ে প্রশ্ন করলো বনহুর।

নূরী পাশেই ছিলো, তার চোখেমুখেও ফুটে উঠেছে একটা অদ্ভুত বিস্ময়কর ভাব। ব্যাকুলভাবে তাকিয়ে আছে সে কায়েসের মুখের দিকে।

কায়েস বলে চলেছে–সর্দার, আমাদের লোকজন যখন খালি গাড়ি নিয়ে ফিরে আসছিলো তখন রাত গভীর। পথ নির্জন, কোথাও জনপ্রাণী নেই। হঠাৎ একটা শব্দ শোনা গেলো। শব্দটা সম্পূর্ণ নতুন এবং অদ্ভুত। আমরা তাকিয়ে আছি অন্ধকারময় আকাশের দিকে।

তারপর? বললো বনহুর।

কিন্তু আমাদের গতি থেমে যায়নি। আমরা অগ্রসর হচ্ছি। হঠাৎ শব্দটা অতি নিকটে মনে হলো, আমরা তাকালাম ওপরের দিকে। সঙ্গে সঙ্গে হারুন চিৎকার করে উঠলো, সেকি ভীষণ আর্তচিৎকার সর্দার।

কি দেখলে?

দেখলাম হারুন শূন্যে ঝুলছে। জমকালো একটা জীব তাকে তুলে নিয়েছে। জীবটা এত কালো যে তাকে অন্ধকারে দেখাই যাচ্ছিলো না তবে মনে হলো

একটা উড়ন্ত জীব সেটা।

হারুন তাহলে....

তাকে মুহূর্তের জন্য আমরা ঝুলন্ত অবস্থায় দেখেছি তারপর আর দেখতে পেলাম না। শূন্যে একটা গোঙানির মত আওয়াজ শোনা যাচ্ছিলো।

বিস্ময়কর সংবাদ।

হাঁ সর্দার।

নূরী বলে উঠলো–হারুনকে পাওয়া যায়নি।

না। ব্যথাভরা কণ্ঠে বললো কায়েস।

আশ্চর্য বটে। তোমাদের সঙ্গে কতজন লোক ছিলো?

আমরা সাতজন ছিলাম।

রহমান ছিলো না তোমাদের সঙ্গে।

না সর্দার, সে কাল রাতে আমাদের সঙ্গে যায়নি কারণ তার যাওয়ার কোনো প্রয়োজন ছিলো না।

তাহলে এখন তোমরা কি করছো?

আমরা বহুক্ষণ মশাল জ্বেলে তার সন্ধান করেছি তারপর আমরা ফিরে এসেছি। ফিরে আসতে রাত ভোর হয়ে গিয়েছিলো।

বনহুরের মুখের দিকে তাকিয়ে দেখলো নুরী একটা গভীর চিন্তার ছাপ ফুটে উঠেছে তার চোখেমুখে।

কায়েস চলে গেলো।

বনহুর শয্যা ত্যাগ করে উঠে দাঁড়ালো, তারপর পায়চারী করতে শুরু করলো।

নূরীর মনে নতুন এক দুশ্চিন্তার ছাপ পড়লো। কতদিন পর বনহুর আস্তানায় ফিরে এসেছে। কত আনন্দ লাগছে তার মনে। বনহুরকে পাশে পাওয়া এ যেন তার সাধনা, চরম ভাগ্য। আবার যেন নতুন এক বিপদ উঁকি দিলো তার জীবনে। বললো নুরী–তোমার কি মনে হচ্ছে হুর? এটা কোনো জীব না কোনো মানুষের ষড়যন্ত্র?

বলা কঠিন নুরী, তবে আমার মনে হয় এর সঙ্গে কোনো রহস্য লুকিয়ে আছে।

নূরী বললো–দরবারকক্ষে এ ব্যাপারে যখন আলোচনা চলবে তখন আমাকে দরবারকক্ষে যাওয়ার অনুমতি দাও হুর?

বনহুর বললো–বেশ যেও।

তোমার স্বাক্ষরযুক্ত প্রবেশপত্র দেবেনা? নূরী কথাটা বলে এক খন্ড কাগজ বনহুরের সামনে বাড়িয়ে ধরলো।

বনহুরের দরবারকক্ষে প্রবেশের অনুমতি ছাড়া কোনো ব্যক্তি প্রবেশ করতে পারতো না, শুধু প্রবেশে সক্ষম ছিলো বনহুরের অনুচরগণ।

নূরীর বাড়িয়ে ধরা কাগজখানায় স্বাক্ষর করলো বনহুর।

*

দরবারকক্ষে হারুনের অন্তর্ধান নিয়ে গভীরভাবে আলোচনা চলছে।

বনহুর জিজ্ঞাসা করলো–হারুন যখন আর্তনাদ করে উঠলো তখন কি তোমরা তাকে দেখতে পাচ্ছিলে?

হাঁ, সর্দার তখন তাকে আমরা দেখতে পাচ্ছিলাম। তবে শূন্যে ঝুলন্ত অবস্থায় ক্ষণিকের জন্য তাকে আমরা দেখলাম তারপর আর দেখা গেলো না। শুধু আকাশের দিকে অন্ধকারে শোনা গেলো হারুনের গোঙ্গানির আওয়াজ। কথাগুলো বললো ইলিয়াস।

বনহুর ভ্রুকুঞ্চিত করে তাকালো অপর একজন অনুচরের দিকে যে ঐ রাতে কায়েসদের সঙ্গে ছিলো। তার নাম মঙ্গল, সে জাতিতে নিগ্রো। নিগ্রো হলেও তার

সাহসিকতা এবং নিষ্ঠা বনহুরকে আকৃষ্ট করেছিলো, তাই বনহুর মঙ্গলকে তার অনুচর হিসেবে গ্রহণ করে ছিলো।

মঙ্গল বললো–সর্দার, অন্ধকার আকাশে আমরা কিছু দেখতে পাচ্ছিলাম না। যদি দেখতে পেতাম তাহলে ছেড়ে দিতাম না, আমার নাম মঙ্গল।

বনহুর জানে মঙ্গল তার একজন দুঃসাহসী অনুচর। সে একবার একটি হিংস্র বাঘকে খালি হাতে গলা টিপে হত্যা করেছিলো। সেই থেকে মঙ্গলকে বনহুর স্নেহ করে কারণ সাহসী ব্যক্তিকে বনহুর সব সময় উপযুক্ত মর্যাদা দেয়।

নূরী একটু দূরে বনহুরের আসনের পাশে বসেছিলো।

তার অদূরে পায়ের কাছে বসেছিলো বাঘা।

আজকাল বাঘা দরবারকক্ষে এসে বসে, প্রায়ই তাকে বনহুরের পাশে দেখা যায়।

নূরী তার সঙ্গী বলা চলে।

ওর মাথায় হাত বুলিয়ে আদর করা, ঝরণার পানিতে গোসল করানো তারপর খেতে দেওয়া সব করে নূরী। অবশ্য ফুল্লরাও এ ব্যাপারে নূরীকে সাহায্য করে।

ফুল্লরার সঙ্গে বাঘা খেলা করে, যেন ওর সাথী সে।

একদিন জাভেদ কিছুতেই ফুল্লরার কথা শুনছিলো না, যতই ফুল্লরা বলছে, এসো ঝরণার পানিতে সাঁতার কাটবো চলো কিন্তু জাভেদ নিশ্চুপ। ফুল্লরার কথা কানেই নিচ্ছিলো না সে।

ফুল্লুরা বললো–থামো তোমাকে মজাটা দেখাচ্ছি।

অদূরে বসে ছিলো বাঘা, ফুল্লরা বললো–বাঘা শোন।

বাঘা উঠে দাঁড়ালো, হাই তুলে লেজ নেড়ে সরে এলো ফুল্লরার পাশে।

ফুল্লরা বললো–এবার দেখবে মজাটা বাঘা ওকে ধরে……আংগুল দিয়ে যেমনি ফুল্লরা জাভেদের দিকে দেখিয়ে দিলো অমনি বাঘা ছুটে গিয়ে আক্রমণ

করলো জাভেদকে।

জাভেদ মোটেই প্রস্তুত ছিলো না, পড়ে গেলো সে।

বাঘা প্রচণ্ডভাবে আক্রমণ করেছে জাভেদকে। ফুল্লরা কিংকর্তব্যবিমূঢ় হয়ে পড়ে। সে ভাবতে পারেনি বাঘাকে ইংগিত করার সঙ্গে সঙ্গে বাঘা জাভেদকে এভাবে আক্রমণ করবো।

ফুল্লরা ছুটে গেলো, চিৎকার করে ব্যস্তকণ্ঠে ডাকতে লাগলো, বাঘা ছেড়ে দে......বাঘা ওকে ছেড়ে দে......বাঘা চলে আয় চলে আয়......

কিন্তু ততক্ষণে জাভেদের অবস্থা কাহিল।

বাঘা সরে আসে জাভেদকে মুক্ত করে দিয়ে। ফুল্লরা তাড়াতাড়ি জাভেদকে তুলে ধরতে যায়।

জাভেদ ধাক্কা দিয়ে সরিয়ে দেয় ফুল্লরাকে।

ক্রুদ্ধ দৃষ্টি দিয়ে তাকায় জাভেদ ফুল্লরার মুখের দিকে।

ফুল্লরা বুঝতে পারে জাভেদ তার ওপর ভীষণ রেগে গেছে।

এবার ফুল্লরা দুহাত জুড়ে ক্ষমা চায়।

মাফ করো আমাকে। আমি ভুল করেছি।

জাভেদ কোনো কথা না বলে উঠে দাঁড়ায় তারপর চলে যায় অদূরে কান্দাই পর্বতের দিকে।

ফুল্লরা ছুটে গিয়ে সব খুলে বলে নূরীর কাছে।

নূরী চিন্তিত হয় এবং তাড়াতাড়ি নিজে ছুটে যায় এবং অনেক বলে কয়ে ফিরিয়ে আনে জাভেদকে।

এরপর ফুল্লরা জাভেদের পাশে যেতে ভয় পায়। লজ্জাও হয় কারণ সেদিন ঠাট্টাচ্ছলে মস্ত একটা ভুল করে বসেছিলো ফুল্লরা। বাধাও কেমন জব্দ হয়ে

পড়েছিলো, সে যেন বুঝতে পেরেছিলো ফুল্লরার নির্দেশ পালন করতে গিয়ে সে অপরাধ করে বসেছে।

নূরী বকেছিলো খুব করে বাঘাকে।

তারপর দুদিন বাঘাকে সে খেতে দেয়নি।

বাঘা অন্তর দিয়ে উপলব্ধি করেছিলো নূরীর মনোভাব তাই সে আরও ঘনিষ্ঠ হতে চায় নূরীর সঙ্গে। বোঝাতে চায় আমি নির্দোষ, আমাকে তুমি ক্ষমা করে দাও।

এ জন্যই আজকাল বাঘা সব সময় নূরীর কাছাকাছি থাকে।

আজও নূরী যখন দরবারকক্ষে প্রবেশ করলো তখন তার সঙ্গে ছিলো বাঘা। সে সব কথা যেন অনুধাবন করে যাচ্ছিলো।

বনহুর সব শোনার পর বললো–হারুন উধাও হলো। কিভাবে তাকে কোন্ জীব তুলে নিলো সব রহস্যময় লাগছে। এ ব্যাপারে যতটুকু তোমাদের মুখে জানলাম তা আমার জন্য যথেষ্ট।

এমন সময় হন্তদন্ত হয়ে দরবারকক্ষে প্রবেশ করে ইলিয়াস নামে এক অনুচর। তার পেছনে আরও দুজন অনুচর একটি প্রাণহীন দেহ নিয়ে প্রবেশ করলো।

মুহূর্তের জন্য দরবারকক্ষ থ হয়ে গেলো। সবাই দেখলো হারুনের প্রাণহীন দেহ বনহুরের দুজন অনুচর বয়ে এনেছে। তারা মৃতদেহটা নামিয়ে রাখলো বনহুরের আসনের সম্মুখে।

ইলিয়াস কুর্ণিশ জানিয়ে বললো–সর্দার, আমরা কান্দাই জঙ্গলের আশেপাশে এবং পর্বতমালার পাদদেশে সন্ধান চালিয়ে চলেছিলাম। রহমান ভাই আমাদের যেভাবে নির্দেশ দিয়েছিলো আমরা সেইভাবে কাজ করছিলাম।

রহমান একপাশে দাঁড়িয়ে ছিলো, সে বললো–সর্দার, আমি জানতাম কোনো প্রাণী যদি হারুনকে তুলে নিয়ে যেয়ে থাকে তবে কান্দাই জঙ্গল অথবা জঙ্গলের আশেপাশে পর্বতমালার পাদদেশে খোঁজ করলে পাওয়া যেতে পারে।

তোমার অনুমান তাহলে সত্য হলো। ভাল করে তাকালো বনহুর হারুনের প্রাণহীন দেহটার দিকে। অন্যান্য সবাই হারুনের দেহটার দিকে তীক্ষ্ণ দৃষ্টি নিক্ষেপ করে দেখছিলো।

মুখ চাওয়া চাওয়ি করছিলো দরবারকক্ষের সবাই।

বনহুর যখন ঝুঁকে দেখছিলো তখন নুরী আর বাঘাও এসে লাশটা ভালভাবে দেখতে লাগলো। সবাই অবাক হলো, দেখলো হারুনের বুকের ঠিক মাঝামাঝি একটা গভীর ক্ষতচিহ্ন। আর কোথাও কোনো আঘাতের চিহ্ন নেই। শুধু তার পরিধেয় বসন ছিন্নভিন্ন।

হারুনের চোখ দুটো গোলাকার এবং স্থির হয়ে আছে। একটা ভীষণ আর ভয়ার্তভাব ফুটে আছে তার চোখের মনি দুটোতে। একটা ভয়ংকর যন্ত্রণার প্রতিচ্ছায়া পরিলক্ষিত হচ্ছে মৃতের মুখমন্ডলে।

বনহুর যখন গভীর মনোযোগ সহকারে পরীক্ষা করে দেখছিলো তখন বাঘাও নাক দিয়ে শুকছিলো লাশটাকে।

নূরীর দুচোখে ভয়ার্ত ভাব ফুটে ওঠে।

আশঙ্কা হয় বনহুরের জন্য। সে এখন এ ব্যাপারে ঝুঁকে পড়বে, আহার–নিদ্রা ত্যাগ করে আবার সে ছুটবে এই রহস্যময় ঘটনা উদঘাটন করতে। না জানি আবার কোন বিপদ নেমে আসবে তার হুরের জীবনে।

বনহুর কিছুক্ষণ গভীরভাবে লাশটা পরীক্ষা করে সোজা হয়ে দাঁড়ালো।

বাঘাও এতক্ষণ একভাবে লাশটা নাক দিয়ে শুকছিলো। তার চোখ দুটোও জ্বলে উঠলো, তীব একটা প্রতিহিংসা জেগে উঠেছে বাঘার চোখেমুখে। একটা অদ্ভুত ধরনের শব্দ সে করতে লাগলো।

বনহুর বাঘার পিঠে হাত বুলিয়ে তাকে চুপ থাকার ইংগিত করলো।

সবাই বললো–হারুনের দেহ থেকে সমস্ত রক্ত শুষে নেয়া হয়েছে।

সবাই দেখলো হারুনের মৃতদেহটা ফ্যাকাশে হয়ে উঠেছে। মৃত্যুর পূর্বে হারুনের দেহ রক্তশূন্য হয়ে পড়েছিলো তাতে কোনো ভুল নেই।

সেদিন থেকে চললো হারুনের হত্যাকারীর সন্ধান। বনহুর তার অনুচরদের অস্ত্র নিয়ে ছড়িয়ে পড়ার নির্দেশ দিলো। সর্বদা তারা সন্ধান করে ফিরছে হারুনকে কোন্ জীব আক্রমণ করেছিলো এবং তার দেহ থেকে রক্ত শুষে নিয়ে তাকে হত্যা করেছে।

বনহুর আর বাঘা তাজ সই রাতের অন্ধকারে গোটা বন চষে ফিরতে লাগলো। বনহুর তাজের পিঠে আর বাঘা তার পেছনে। রাতের অন্ধকারে বাঘার চোখ দুটো আগুনের গোলার মত জ্বলে।

নূরী যা ভয় পেয়েছিলো তাই হলো।

বনহুর সব সময় ব্যস্ত থাকে, তাকে খুঁজে বের করতেই হবে এই নির্মম হত্যারহস্য।

এই ঘটনার দুদিন পর আবার দেখা গেলো বনহুরের অপর একজন অনুচর অন্তর্ধান হয়েছে। নাম তার মাহাঙ্গু। জাতিতে সে ছিলো মারাঠা। মাহাঙ্গু দুঃসাহসী এবং ভীষণ শক্তিশালী ছিলো। তেমনি ছিলো সে বিশ্বাসী।

মাহাঙ্গুর অন্তর্ধানে সবার মাথায় যেন বাজ পড়লো। তবে কি তারও অবস্থা হারুনের মত হয়েছে। সবাই আতঙ্কিত হয়ে পড়লো।

রহমানের মুখমন্ডল বিষণ্ণ, কারণ মাহাঙ্গু তাদের অতি পুরানো অনুচর। যেমন হারুন তেমনি সেও ছিলো বিশ্বাসী।

সমস্ত জঙ্গলে সন্ধান চালিয়েও পাওয়া গেলো না মাহাঙ্গুকে।

বনহুর মাহাঙ্গুর একটি জামা বাঘার নাকের কাছে ধরে বললো–বাঘা, মাহা কোথায় খুঁজে বের কর। যা কোথায় সে দেখগে।

বাঘা বনহুরের কথা বুঝলো, সে মাহাদুর জামাটা বারবার ওকে দেখলো তারপর চলে গেলো।

সমস্ত দিন বাঘাকে আর দেখা গেলো না। রাতেও বাঘা ফিরে এলো না। পরদিন ভোরে বাঘা হাঁপাতে হাঁপাতে এসে হাজির।

বনহুর তখন সবে তাজের পিঠে আরোহণ করতে যাচ্ছে, ঠিক এমন সময় বাঘ এসে বনহুরের প্যান্টের অংশ ধরে দাঁত দিয়ে টানতে শুরু করলো, যদিও সে রীতিমত হাঁপাচ্ছিলো।

বুঝতে পারলো বনহুর বাঘা কোথাও মাহাঙ্গুর সন্ধান পেয়েছে, তাই সে তাকে জানাতে এসেছে। বাঘার ইংগিত পেয়ে রহমানকে লক্ষ্য করে বললো–রহমান, কিছু অনুধাবন করতে পেরেছো?

হাঁ সর্দার।

তাহলে অশ্বপৃষ্ঠে চেপে বসো। চলো আমরা ওকে অনুসরণ করি।

চলুন সর্দার।

রহমান আর বনহুর নিজ নিজ অশ্বপৃষ্ঠে চেপে বসলো।

বাঘা এবার ছুটতে শুরু করলো।

তাজকে হার মানিয়ে ছুটছে বাঘা।

বনজঙ্গল পেরিয়ে বহুদূর চলে এলো বাঘা। একটানা ছুটছে বাঘা।

তাজ আর দুলকিরও বিরাম নেই।

তারাও বাঘাকে অনুসরণ করে উল্কাবেগে ছুটছে।

এক পর্বতের পাদমূলে এসে থামলো বাঘা।

বনহুর আর রহমান নেমে দাঁড়ালো।

বাঘা এবার বনহুর আর রহমানের চারপাশে ঘুরে কিছু বোঝাতে চেষ্টা করলো, তারপর সে পর্বতের গা বেয়ে উঠতে লাগলো লাফিয়ে লাফিয়ে।

বনহুর রহমানকে লক্ষ্য করে বললো–নিশ্চয়ই বাঘা মাহাঙ্গুর সন্ধান পেয়েছে তাই সে এভাবে এগুচ্ছে।

রহমান বললো–হাঁ সর্দার, আমারও তাই মনে হচ্ছে। চলুন দেখা যাক ও কোথায় যায়।

বনহুর তাজের পিঠ চাপড়ে বললো–এখানে থাক আমি ডাকলেই যাবি।

রহমানও নিজের অশ্বের পিঠে–মাথায় হাত বুলিয়ে নিলো। তারপর সর্দারের সঙ্গে এগুতে লাগলো।

পর্বতমালার গা বেয়ে উঠে যাচ্ছে বাঘা তার পেছনে পেছনে তাকে অনুসরণ করছে বনহুর আর রহমান। উঁচুনীচু, সমতলঅসমতল জায়গা এগুতে গিয়ে বেশ বেগ পেতে হচ্ছিলো ওদেরকে।

অনেকটা সময় লাগলো পর্বতের উপরে উঠতে।

প্রায় মাঝামাঝি এসে পড়লো তারা।

এমন সময় একটা পচা গন্ধ নাকে প্রবেশ করলো বনহুর আর রহমানের।

বললো বনহুর–রহমান, আমরা মাহাঙ্গুকে জীবিত পাবো না। তার লাশ পচে গেছে বলে আমার ধারণা হচ্ছে।

হাঁ সর্দার, আমারও তাই মনে হচ্ছে। ভীষণ উকট একটা গন্ধ পাওয়া যাচ্ছে। আমরা ঠিক জায়গায় এসে পড়েছি সর্দার। বাঘা মাহাঙ্গুকে খুঁজে বের করতে সক্ষম হয়েছে বলে মনে হচ্ছে।

ঠিক এমন সময় বাঘা থেমে যায়।

বনহুর আর রহমান দেখলো পর্বতের ওপরে এক স্থানে মাহাঙ্গুর লাশ পড়ে আছে।

দুর্গন্ধ ছড়িয়ে পড়েছে চারদিকে।

বনহুর আর রহমান নাকে রুমালচাপা দিয়ে লাশের পাশে গেলো। দেখলো হারুনের যে অবস্থা ঠিক সেই অবস্থায় মৃত্যুবরণ করেছে মাহাঙ্গু। নির্মম মৃত্যু। বুকের একপাশে ক্ষতচিহ্ন। ঐ স্থান ছাড়া দেহের আর কোনো স্থানে কোনো ক্ষত নেই। পরিধেয় বস্ত্র ছিন্ন ভিন্ন।

বনহুর বললো–যেভাবে হারুনের রক্ত শুষে নেয়া হয়েছিলো ঠিক সেভাবে মাহাঙ্গুর দেহেরও রক্ত শুষে নেয়া হয়েছে। একটু থেমে বললো বনহুর–বড় রহস্যময় ব্যাপার রহমান। লাশ নিয়ে যাওয়া সম্ভব নয়। এখানেই ওকে পাথরচাপা দিয়ে সমাধিস্থ করা হোক।

তাই ভাল হবে সর্দার।

বনহুর আর রহমান মাহাঙ্গুর লাশটা পাথরচাপা দিয়ে সমাধিস্থ করলো। বাঘা যেন সব বুঝতে পারছে, সে পাথরগুলো এনে দিতে না পারলেও চেষ্টা করছে বনহুর আর রহমানকে সহায়তা

মাহাঙ্গুর লাশ সমাধিস্থ করার পর বনহুরের চোখ দিয়ে গড়িয়ে পড়লো দুফোঁটা অশ্রু।

ফিরে এলো বনহুর আর রহমান পর্বতমালার পাদদেশে। বাঘাও এলো।

ওদের চোখেমুখে বিষণ্নতার ছাপ।

বনহুরের ললাটে ফুটে উঠেছে গভীর চিন্তারেখা। ক্রমেই সব যেন বড় বিস্ময়কর লাগছে।

বনহুর তাজের পিঠে উঠতে যাবে ঠিক তখন একটি অদ্ভুত ধরনের তীরফলক এসে গেঁথে গেলো বনহুরের পায়ের কাছে।

বনহুর আর রহমান তাকালো তীরফলকটার দিকে। ওটা কোন্ দিক থেকে এলো ঠিক বোঝ গেলো না।

রহমান বললো–সর্দার, তীরফলকে একটি কাগজ গাঁথা আছে।

বনহুর ততক্ষণে তীরফলকটা তুলে এবং তীরফলকে যে কাগজখানা গাঁথা আছে তা খুলে নিয়েছে হাতে।

রহমান এসে পাশে দাঁড়ালো।

বনহুর কাগজের ওপরে লক্ষ্য করতেই দেখলো একটি লাল রঙের ঝাপসা বাদুড়ের প্রতিচ্ছবি আঁকা রয়েছে কাগজখানায়। শুধু দুটো কথা লেখা আছে রক্তরাঙা বাদুড়ের দেহের মধ্যে– সাবধান বনহুর, তোমার রক্তও আমি শুষে নেবো যেমন করে তোমার দুজন অনুচরের রক্ত শুষে নিলাম।

বনহুর আর রহমান দুজনের চোখেই বিস্ময়। তারা বুঝতে পারে এ হত্যা কোনো জীবের দ্বারা সংঘটিত হয়নি, এর পেছনে আছে কোনো কুচক্রের করাল থাবা।

হঠাৎ বনহুর আপন মনে হেসে উঠলো, সে কি ভীষণ হাসির শব্দ। সমস্ত পর্বতমালা যেন থরথর করে কেঁপে উঠলো।

অবাক হয়ে তাকিয়ে আছে রহমান বনহুরের মুখের দিকে।

তাজ আর রুহীও তাকিয়ে দেখছে কারণ তারাও বুঝতে পেরেছে কোনো গভীর রহস্যের সন্ধান তাদের সর্দার পেয়েছে।

*

বনহুর চিন্তাযুক্তভাবে পায়চারী করছিলো। তার মুখোভাব গম্ভীর। প্যান্টের পকেট থেকে সেই তীরবিদ্ধ লাল বাদুড়ের প্রতিচ্ছবিসহ চিঠিখানা বের করে চোখের সামনে মেলে ধরলো।

নূরী এসে দাঁড়ালো তার পাশে।

বনহুরের মুখোভাব লক্ষ্য করে নূরী বললো–ওটা কি?

বললো বনহুর–রক্তপায়ী বাদুড়।

হাঁ

রক্তপায়ী বাদুড়।

কোথায়? কোথায় রক্তপায়ী বাদুড়?

এই দেখো। বনহুর ছোট্ট চিঠি আকারে কাগজখানা নূরীর হাতে দিলো।

নূরী সামান্য লেখাপড়া শিখেছে বলে, সে একটু আধটু পড়তে পারতো। মনোযোগ দিয়ে দেখালো রক্তাভ বাদুড়ের ছবিখানা। লেখাটা পড়ে দুচোখ কপালে তুলে ভয়বিহ্বল কণ্ঠে বললো–হারুন আর মাহাঙ্গুর মত তোমার রক্তও শুষে নেবে রক্তপায়ী বাদুড় ......না না, তা হতে দেবো না আমি। হুর, তোমাকে আমি ওভাবে মরতে দেবো না।

নুরী, তুমি মিছামিছি ভয় পাচ্ছো।

মিছামিছি নয় হুর। আমি নিজের চোখে দেখেছি হারুনের নির্মম মৃত্যুর শেষ পরিণতি। মাহাঙ্গুর প্রাণহীন গলিত লাশের সম্বন্ধে সব কথা শুনেছি। উঃ কি ভয়ংকর আর ভীষণ পরিণতি......

বনহুর অট্টহাসিতে ফেটে পড়লো।

নূরী বললো–হাসছো যে?

আজও তোমার ভয় পূর্বের মতই আছে।

আমি তোমার কোনো কথা শুনতে চাই না। তোমাকে আমি......

লুকিয়ে রাখবে তোমার ওড়নার নিচে?

শুধু ঠাট্টা। নূরী বনহুরের জামার আস্তিন এটে ধরে ঝাঁকুনি দিয়ে বললো–কোনো কথা শুনবো না। কত বার কত বিপদ থেকে তুমি উদ্ধার পেয়েছে কিন্তু......।

বনহুর নূরীকে বাহুবন্ধনে আবদ্ধ করে বলে–ভয় সেই নূরী। তুমি তো জানো বিপদের সঙ্গে লড়াই করাই আমার স্বভাব। তা ছাড়া বিপদ কাকে বলে আমি জানি না......

তোমার সেই এক কথা। এ স্বভাব তোমার যাবে না কোনোদিন?

বনহুর নূরীর চিবুকটা তুলে ধরে বলে–তোমাদের দোয়া আমার পাথেয় নূরী।

যাও আর তোমাকে কোনো কথা বলবো না। এখন তোমার সাবধান হওয়া উচিত।

নূরী, আমার চোখের সামনে নিহত হলো আমার দুজন অনুচর আর আমি নিশ্চুপ দেখে যাবো। তুমি তো জানো মৃরী অনুচরগণ আমার কত প্রিয়। তাছাড়া এতো বড় যাদের সাহস, যারা আমার কাছে চিঠিতে সাবধানবাণী প্রেরণ করতে পারে আমি তাদের ক্ষমা করবো। দেখে নেবো রক্তপায়ী বাদুড়টাকে যে হারুন আর মাহাঙ্গুকে…

এমন সময় রহমান এসে দাঁড়ালো দরজার বাইরে। ভেসে এলো তার কণ্ঠস্বর–সর্দার!

এসো রহমান। বললো বনহুর।

নূরী সরে দাঁড়ালো, না জানি আবার কি সংবাদ রহমান নিয়ে এসেছে।

রহমান কক্ষে প্রবেশ করে তাকালো প্রথমে বনহুর তারপর নূরীর দিকে।

বললো বনহুর–কি সংবাদ রহমান?

রহমান বললো–সর্দার, জাভেদকে পাওয়া যাচ্ছে না।

নূরী অস্ফুট আর্তনাদ করে উঠলো–জাভেদকে পাওয়া যাচ্ছে না। তার অশ্ব জাম্বুও নেই।

রহমান বললো–কাল সন্ধ্যার পর থেকে তাকে কোথাও পাওয়া যাচ্ছে না। তার অশ্ব জাম্বুও নেই।

বনহুর হাঁফ ছেড়ে বললো–কতকটা নিশ্চিন্ত হলাম। যাক, ওকে তাহলে রক্তপায়ী বাদুড় তুলে নিয়ে যায়নি।

কি করে বুঝলে?

কারণ জাভেদ তার অশ্ব নিয়ে গেছে।

তবুও আমার ভয় হচ্ছে। বললো নূরী।

রহমান বললো–সর্দার, আমি তার সন্ধানে কয়েকজনকে অশ্ব নিয়ে পাঠিয়েছি। আমিও কি যাবো?

নুরী ব্যাকুল কণ্ঠে বললো–তুমিও যাও রহমান ভাই। আমার বড় ভয় জাভেদের যদি কোনো অমঙ্গল হয়। যাও রহমান ভাই।

বললো বনহুর–শ্যাও। যদি ওকে খুঁজে পাও তাহলে আশার ওখানে নিয়ে যেও।

আচ্ছা সর্দার। কুর্ণিশ জানিয়ে বেরিয়ে গেলো রহমান।

নূরী বললো–চলো না আমি আর তুমিও বেরিয়ে পড়ি?

চলো। বনহুর উঠে দাঁড়ালো।

নূরী আর বনহুর বেরিয়ে এলো আস্তানার বাইরে।

সম্মুখে নাসরিনকে দেখতে পেয়ে বললো নূরী–ফুল্লরা কোথায়?

নাসরিন বিষণ্ণ কণ্ঠে বললো–জাভেদকে দেখতে না পেয়ে বেচারী কেঁদেকেটে অস্থির। কিছুতেই ওকে ধরে রাখতে পারলাম না। ও দুর্কীকে নিয়ে বেরিয়ে গেছে।

বনহুর কোনো কথা বললো না, সে নাসরিনের কথাগুলো সব শুনে যাচ্ছিলো।

এবার বললো নুরী–ওর আবার কোনো বিপদ আপদ না ঘটে। চিন্তিতভাবে কথাগুলো বললো

অনেক সন্ধান চালিয়েও জাভেদকে পাওয়া গেলো না, ব্যর্থ হয়ে হতাশ মনে ফিরে এলো বনহুর আর নূরী। একটা ক্ষীণ আশা বুকে উঁকি দিচ্ছিলো নূরীর, নিশ্চয়ই রহমান তার জাভেদের সন্ধান নিয়ে ফিরে আসবে।

*

দুদিন পর ফিরে এলো রহমান তার সঙ্গীসাথীদের নিয়ে। কিন্তু তাদের সঙ্গে জাভেদকে দেখা গেলো না।

বনহুর অনেক ধৈর্য নিয়ে আস্তানায় ছিলো, নূরীকে বনহুর সান্ত্বনা দিয়ে স্থির রাখার চেষ্টা করছিলো। নূরী তবুও ভীষণ কান্নাকাটি করছিলো। তার ভয় রক্তপায়ী বাদুড় জাভেদকে হত্যা করে না বসে।

ইতিমধ্যে শহরে আরও কয়েকটি ব্যক্তিকে বিভিন্ন স্থানে নিহত অবস্থায় পাওয়া গেছে, তাদের প্রত্যেকটি ব্যক্তির বুকে একটি ক্ষতচিহ্ন এবং মৃত্যুর পূর্বে তাদের দেহ থেকে রক্ত শুষে নেয়া হয়েছে।

সংবাদটা বনহুরের শহরের আস্তানা থেকে অনুচরগণ—- জানিয়েছে। এ ছাড়াও তারা সংবাদপত্রগুলো কান্দাই বনহুরের আস্তানায় পাঠিয়ে দিয়েছে।

শহরেই শুধু নয়, শহরতলী এবং পল্লী এলাকাগুলোতেও এ আতঙ্ক ছড়িয়ে পড়েছে। সবার মুখে মুখে ঐ একই কথা–বিস্ময়কর হত্যাকান্ড। মৃতদেহগুলোর পাশে পাওয়া যায় একটি চিঠি। চিঠিতে লেখা থাকে মাত্র তিনটি কথা– সাবধান, রক্তপায়ী বাদুড়

বনহুরের চোখ দুটো জ্বলে ওঠে। তখন বনহুর ভুলে যায় জাভেদের কথা। রক্তপায়ী বাদুড়ের চিন্তা তার মাথায় আগুন ধরিয়ে দেয়।

বনহুর শহরে যাওয়ার জন্য প্রস্তুত হয়ে নেয়। যেমন করে হোক রক্তপায়ী বাদুড়ের সন্ধান তাকে করতেই হবে। দরবারকক্ষে অনুচরদের সঙ্গে গোপনে আলোচনা হয় তার। কি আলোচনা হয় সবাই তা জানতে পারে না। রহমান আরো কয়েকজন বিশ্বস্ত অনুচর নিয়ে হলো এই আলোচনা।

বনহুর যখন কান্দাই জঙ্গল সীমা অতিক্রম করে পর্বতের পাদমূলে এসে পৌঁছলো তখন গভীর রাত।

একটা মোটর সাইকেল নিয়ে একজন দাঁড়িয়েছিলো সেখানে।

বনহুর অশ্ব থেকে নেমে দাঁড়াতেই লোকটা কুর্ণিশ জানালো।

বনহুর বললো–পথে কোনো অসুবিধা হয়নিতো?

বললো লোকটানা সর্দার। তবে আমার মনে হলো কেউ আমাকে অনুসরণ করছিলো।

কি করে বুঝলে? প্রশ্ন করলো বনহুর।

লোকটা বললো–আমার মোটর সাইকেলের পেছনে বেশ দূরে বার বার একটা অদ্ভুত শব্দ হচ্ছিলো কিন্তু কিছুই নজরে পড়েনি। অবশ্য আমি প্রস্তুত ছিলাম শত্রুর আক্রমণ প্রতিহত করার জন্য।

সাবাস! এবার তুমি তাজকে নিয়ে আস্তানায় যাও। সময়মত তাজসহ চলে আসবে।

লোকটা কুর্ণিশ জানিয়ে তাজের লাগাম চেপে ধরলো।

বনহুর মোটর সাইকেলটায় চেপে বসলো।

রাতের অন্ধকারে একটা শব্দ জেগে উঠলো পর্বতমালার পাদমূলে। মোটর সাইকেল নিয়ে বনহুর স্পীডে এগিয়ে চললো। সার্চলাইটের আলোতে অন্ধকার পথ দীপ্ত আলোময় হয়ে উঠলো।

মোটর সাইকেলে বনহুর দ্রুত এগিয়ে যাচ্ছে, এক পাশে কান্দাই পর্বতমালা অপর পাশে ঘন জঙ্গল। দিনের বেলায়ও কেউ এ পথে আসে না। দুর্গম পথ। হিংস্র জীবজন্তুর হামলা যে কোনো মুহূর্তে ঘটতে পারে। এ ছাড়াও কোন পথচারী এ পথে চলে না, কারণ দস্যু বনহুরের আবির্ভাব ঘটা অস্বাভাবিক নয়।

এ পথ যেন শুধু বনহুরের।

তাই সে বিনাদ্বিধায় এগুচ্ছে।

হঠাৎ একটা শব্দ কানে ভেসে এলো, অদ্ভুত আর বিস্ময়কর আওয়াজ। বনহুর এ ধরনের শব্দ ইতিপূর্বে শুনেছে বলে তার স্মরণ হলো না। তাকালো বনহুর পর্বতের দিকে। জমাট অন্ধকার ছাড়া আর কিছুই নজরে পড়লো না।

বনহুর আরও স্পীড বাড়িয়ে দিলো তার মোটর সাইকেলের নির্জন পর্বতের পাদমুলে সম্পূর্ণ সে একা। শব্দটা যেন ক্রমান্বয়ে আরও স্পষ্ট হয়ে উঠলো।

জমাট অন্ধকার আরও জমাট লাগছে।

কিছুক্ষণ পর্যন্ত তাজের খুরের শব্দ কানে ভেসে এসেছিলো, এখন তা সম্পূর্ণ মিশে গেছে। বনহুর আশঙ্কা করছে তার অনুচরটির জন্য কারণ রক্তপায়ী বাদুড় তার ওপর হামলা চালাবে না

বনহুর হাতঘড়িটা মুখের কাছে ধরে নিয়ে কান্দাই আস্তানায় কথা বললো। হাতঘড়িটা আসলে ক্ষুদে ওয়্যারলেস। বললো বনহুর......রহমান, আমি এখন কান্দাই পর্বতমালার হিন্দহং পথ ধরে এগুচ্ছি.....একটা শব্দ আমার কানে ভেসে আসছে......মহসীন তাজকে নিয়ে আস্তানার পথে রওনা হয়ে গেছে.....পথে ওর কোনো বিপদ না ঘটে.....পৌঁছলেই আমাকে জানিয়ে দেবে........

রহমান ওদিকে ওয়্যারলেস মেশিনের সম্মুখেই বসে ছিলো, সে বলে উঠলো......সর্দার শব্দটা কেমন ধরনের......কোনো জীবজন্তুর গলার শব্দ.....না কোনো মেশিন বা যন্ত্রের......।

..হাঁ, কোনো মেশিন বা যন্ত্রের আওয়াজ বলে মনে হচ্ছে......শব্দটা এখন আরও স্পষ্ট লাগছে......আমার গাড়ির স্পীড এখন সর্বশেষ মিটারে চলছে...... এখন আমি হিন্দহং পথ ছেড়ে ব্রীজের কাছাকাছি এসে পড়েছি....

সর্দার, সাবধানে এগুবেন.....ব্রীজ খুলে রাখার সম্ভাবনা আছে.....ব্রীজে ওঠার সঙ্গে সঙ্গে গভীর খাদে পড়ে যেতে পারেন......।

সম্মুখে ব্রীজ। বনহুর হাত নামিয়ে নিলো, কথা বন্ধ হলো তার আর রহমানের মধ্যে। বীজটাকে অন্ধকারে ঝাপসা দেখা যাচ্ছে। ব্রীজের নিচে গভীর খাদ। তলদেশে জলাশয় বা মাটি নয় কঠিন পাথর। কোনোক্রমে পড়ে গেলে মৃত্যু অনিবার্য, তবে সে মৃত্যু অতি ভয়ংকর।

বনহুর এবার তার মোটর সাইকেলের স্পীড কিছু কমিয়ে নিলো, ঐ মুহূর্তে শব্দটা যেন তার ঠিক মাথার উপরে মনে হলো।

শব্দটা তীব্র নয়, একটা যান্ত্রিক ক্ষীণ শব্দ।

বনহুর বুঝতে পারলে কোনো যান্ত্রিক দানব তার ওপর হামলা করতে এগিয়ে আসছে। বনহুর পুনরায় স্পীড পূর্বের চেয়ে অধিকতর বাড়িয়ে দিলো এবং

ব্রীজের দিকে না এগিয়ে ব্রীজের পাশের দিকে এগুলো। এত বেশি স্পীড বাড়িয়ে দিলো বনহুর তার মোটর সাইকেলের যার জন্য ভীষণ এক ঝুঁকি নিয়ে বনহুর মোটর সাইকেল সহ হিন্দহং ব্রীজের ওপাশে গিয়ে পৌঁছলো।

ঠিক সেই মুহূর্তে ব্রীজটা সশব্দে খসে পড়লো খাদের তলদেশে।

বনহুর সেই ভীষণ আর ভয়ংকর শব্দে চমকে উঠলেও বিচলিত হলো না। তার কানের কাছে রহমানের কণ্ঠস্বরের প্রতিধ্বনি জাগলো, সর্দার, হিন্দহং ব্রীজের ওপরে যাবেন না। শত্রু ব্রীজ খুলে রাখতে পারে ……বনহুরের মোটর সাইকেল পূর্ণবেগে ছুটলো।

একি, শব্দটা ঠিক তার মাথার ওপরই মনে হচ্ছে। বনহুর আরও দ্রুত স্পীড বাড়িয়ে দিলো। আর বেশিদূর এগুনো তার সম্ভব হলো না, প্রচন্ড ধারালো একটা থাবা তুলে নিলো তাকে শূন্যে।

[পরবর্তী বই করাল থাবা]

পূর্ববর্তী:

« ৭.১৬ ভৌতিক গহ্বর

পরবর্তী:

৭.১৮ করাল থাবা »